স্বামী-স্ত্রী সুখী হওয়ার নীতিমালা

বা

দাম্পত্য জীবনের অমূল্য রত্ন

মুফতি শাহ মুহাঃ সাইফুল্লাহ

স্বামী-স্ত্রী সুখী হওয়ার নীতিমালা

বা

দাম্পত্য জীবনের অমূল্য রত্ন

লেখক

মুফতি শাহ মুহাঃ সাইফুল্লাহ

(ট্রিপল টাইটেল, এম.এফ. ফার্স্ট ক্লাস)

অধ্যক্ষ

দুধল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ-বরিশাল।

প্রকাশক

মুফতি শাহ মোঃ ছফিউল্লাহ

(ট্রিপল টাইটেল, দাওরায় হাদীস ফোর্থ স্ট্যান্ড)

মেঝ সাহেবজাদা

দুধল দরবার শরীফ, বাকেরগঞ্জ-বরিশাল।

মুফতি শাহ মোঃ শরীয়াতুল্লাহ

(ডবল টাইটেল, অল ফার্স্ট ক্লাস)

ছোট সাহেব জাদা

দুধল দরবার শরীফ, বাকেরগঞ্জ-বরিশাল।

মুদ্রণে

মুফতি মোঃ ইউনুছ হাওলাদার

(ডবল টাইটেল, এম.এফ. ফোর্থ স্ট্যান্ড)

অধ্যক্ষ

তাছাওউফ কোচিং সেন্টার

পরিচালক

আরবী, অংক, ইংরেজী কোচিং সেন্টার

দুধল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ-বরিশাল।

মুফতি মুহাঃ মুঈনুল ইসলাম

(ডবল টাইটেল, এম.এফ. ৭ম স্ট্যান্ড)

অধ্যক্ষ

আরবী, অংক, ইংরেজী কোচিং সেন্টার

সমন্বয়কারী

তাছাওউফ কোচিং সেন্টার

দুধল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ-বরিশাল।

মুফতি মুহাঃ মহিউদ্দীন মিয়া

অল ফার্স্ট ক্লাস

উপাধ্যক্ষ

তাছাওউফ কোচিং সেন্টার

আরবী, অংক, ইংরেজী কোচিং সেন্টার

দুধল ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ-বরিশাল।

স্বামী-স্ত্রী সুখী হওয়ার নীতিমালা সারা বিশ্বে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মীয় সাহায্য স্বরূপ বিনিময় মুল্যঃ ৩০টাকা।

দুধল মাদ্‌রাসা প্রকাশনী, তাছাওউফ লাইব্রেরী

পোঃ দুধল মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

কোন পাতায় কি পাবেন

০১। ভূমিকা ---------- ১
০২। বিশেষ জরুরী বক্তব্য ---------- ২
০৩। নেককার ছেলে-মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করান উচিত ---------- ৩
০৪। কয়টি দোষের জন্য স্ত্রীকে মালা বিধান আছে ---------- ৪
০৫। আল্লাহ্ তায়ালা কেমন সংসার কামনা করেন ---------- ৪
০৬। সুখী হওয়ার জন্য পর্দা একটি অন্যতম মাধ্যম ---------- ১২
০৭। পর্দা না থাকলে ঘরে রহমতের ফেরেস্তা থাকে না ---------- ১৬
০৮। আল্লাহ্ ব্যতিত কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে সে সিজদা পেত স্বামী ---------- ১৭
০৯। স্ত্রী সর্বদা স্বামীর আদেশ পালন করবে ---------- ১৭
১০। স্বামীর সাথে ভাল আচরণ করলে স্বামীর নেক আমলের সওয়াবও স্ত্রীরা পাবে ---------- ১৮
১১। আল্লাহ্ তায়ালা কোন ধরনের স্ত্রীদের পছন্দ করেন ---------- ১৮
১২। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল ইবাদত করা উচিত নয় ---------- ১৮
১৩। কোন্ কোন্ সময় স্বামীর ডাকে সাড়া না দিলে ফেরেস্তাগণ অভিশাপ দিতে থাকেন ---------- ১৮
১৪। স্বামীর অসন্তুষ্ট অবস্থায় স্ত্রী মারা গেলে সে বেহেস্তে যাবে না ---------- ১৯
১৫। স্বামীকে কষ্ট দিলে বেহেশ্তের হুরেরা ধিক্কার দিতে থাকেন ---------- ১৯
১৬। স্বামীর না শোকরীতে জাহান্নাম ---------- ১৯
১৭। যেভাবেই হোক স্বামীর খেদমত করা উচিত ---------- ১৯
১৮। স্বামীর অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ও অসন্তষ্ট ---------- ১৯
১৯। স্বামীর অনুমতি ব্যতিত স্ত্রীদের কোথাও যাওয়া উচিত নয় ---------- ২০
২০। কোন্ কাজ করিলে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ার সমান ছওয়াব হয় ---------- ২০
২১। নেক্কার স্ত্রীরাই স্বামীদের আনুগত্য করে ---------- ২০
২২। স্ত্রীদের ঘরের টুকি-টাকি কাজগুলোও ছাওয়াবের অন্তর্ভূক্ত ---------- ২১
২৩। স্ত্রীদের সুন্দরী ও রূপসী হবার মূলমন্ত্র কি? ---------- ২১
২৪। কোন্ স্ত্রীর নামাজ কবুল হয় না ---------- ২২
২৫। কোন্ স্ত্রী জান্নাতী ---------- ২২
২৬। সহবাসের সময় কি নিয়ত করা উচিত ---------- ২২
২৭। আল্লাহ্ কোন মহিলার দিকে রহমতের দৃষ্টি দান করেন না ---------- ২৩
২৮। স্ত্রীদের জিদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা উচিত ---------- ২৩
২৯। স্ত্রীদের স্বামীর সামনে সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত থাকা উচিত ---------- ২৩
৩০। পূর্নাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমলের মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ---------- ২৪
৩১। স্ত্রীদের ব্যবহারে আল্লাহর আরশ কখনও হাসে আবার কখনও কাঁদে ---------- ২৪
৩২। স্বামীর এনে দেয়া যে কোন জিনিস স্ত্রীর আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করা উচিত ---------- ২৫
৩৩। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কি করা উচিত ---------- ২৫
৩৪। বৈবাহিক জীবনে মনোমালিন্য ও অভিমান হলে তা কিভাবে নিস্পত্তি করবেন ---------- ২৬
৩৫। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি গভীর ভালবাসা থাকা উচিত ---------- ২৬
৩৬। স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভাল আচরণ করবে ---------- ২৭
৩৭। স্ত্রীকে যাহা কিছু দেওয়া হয় তাতে ছওয়াব হয় ---------- ২৭
৩৮। কোন্ কাজ করলে আইয়ুব (আঃ) এর ধৈর্য্যের সমান ছাওয়াব হয় ---------- ২৮
৩৯। স্ত্রীদের কৌশলে সংশোধন করা প্রয়োজন ---------- ২৮
৪০। একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিধান ---------- ২৯

স্বামী-স্ত্রী সুখী হওয়ার নীতিমালা বা দাম্পত্য জীবনের অমূল্য রত্ন

৪১। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে দ্বীনি কাজে সহযোগিতা করা প্রয়োজন ---------- ২৯
৪২। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের উপর অধিকার রয়েছে ---------- ৩০
৪৩। স্বামী-স্ত্রীর পরিচালক, তাই বলে শোষণ করা উচিত নয় ---------- ৩০
৪৪। অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার পদ্ধতি ---------- ৩০
৪৫। আল্লাহ্তায়ালা কার সাথে দুশমনী রাখেন ---------- ৩১
৪৬। স্ত্রীকে মারধর করা ও অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করা হাদীসের খেলাফ ---------- ৩২
৪৭। স্ত্রীর ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয় ---------- ৩২
৪৮। স্বামীর সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন ---------- ৩২
৪৯। স্ত্রীকে মহরানা না দিলে কিয়ামতের দিন যিনাকার হিসেবে উঠবে ---------- ৩৩
৫০। স্ত্রীদের সহিত সুখকর গল্প ও আনন্দ দেয়ারমত কথা বলা উচিত ---------- ৩৪
৫১। স্বামীকে স্ত্রীর ব্যাপারে কুকথায় ভ্রুক্ষেপ করা অনুচিত ---------- ৩৪
৫২। স্বামীকে কিছু বিষয়ে মনোযোগী ও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন ---------- ৩৫
৫৩। স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া অন্যায় ---------- ৩৫
৫৪। শতবার ভাল ভাল ব্যবহারের পর হঠাৎ ২/১টি খারাপ আচরণ ধর্তব্য নয় ---------- ৩৫
৫৫। স্বামীর দোয়ার কি আশ্চর্য ফল ---------- ৩৬
৫৬। স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা কত বড় অপরাধ ---------- ৩৮
৫৭। স্বামীর প্রতি কি আশ্চর্য দরদ ---------- ৩৯
৫৮। স্বামীকে কষ্ট দেয়ার ফল ভাল নয় ---------- ৪১
৫৯। উত্তম স্ত্রী কে? ---------- ৪১
৬০। স্বামী-স্ত্রীর জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম ---------- ৪১
৬১। স্বামী-স্ত্রীর নেকী অর্জনের সহজ পন্থা ---------- ৪২
৬২। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধির উপায় ---------- ৪৩
৬৩। স্ত্রীদের আরাম আয়েশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ---------- ৪৩
৬৪। স্বামীর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা প্রয়োজন ---------- ৪৩
৬৫। সুখে দুঃখে পিতা মাতার পরে স্ত্রীই সাথী হন ---------- ৪৪
৬৬। স্ত্রীকে কিছু হাত খরচ দেয়া প্রয়োজন ---------- ৪৫
৬৭। একটি মজার কাহিনী ---------- ৪৫
৬৮। জনৈক ব্যক্তির কাহিনী ---------- ৪৬
৬৯। মহিলাদের ভিতরে তিনটি গুণ থাকা অত্যন্ত জরুরী ---------- ৪৭
৭০। শ্বশুর বাড়ির লোকদের সাথে আচার-ব্যবহার ---------- ৪৮
৭১। ঘরের জিনিসপত্র যথা স্থানে রাখা উচিত ---------- ৪৯
৭২। স্বামীর হুকুম পালনের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে ---------- ৫০
৭৩। কন্যা সন্তান হওয়া এবং নিঃসন্তানী হওয়ার জন্য স্ত্রীরা দায়ী নয় ---------- ৫০
৭৪। স্বামীর বার্ধক্য অবস্থায় খেদমতের প্রতি বেশী মনোযোগী হওয়া উচিত ---------- ৫১
৭৫। শাশুড়ীর খেদমত না করায় নবীজী (সাঃ) এর ধমক ---------- ৫১
৭৬। শাশুড়ীর খেদমত না করায় হযরত আলী (রাঃ) এর বেত্রাঘাত ---------- ৫১
৭৭। স্ত্রীদের প্রতি নছিহত ---------- ৫২
৭৮। বউদের প্রতি নছিহত ---------- ৬১
৭৯। শাশুড়ীদের প্রতি নছিহত ---------- ৬৬
৮০। স্বামীদের প্রতি নছিহত ---------- ৬৯
৮১। নবী পত্নী হজরত রহিমার নিঃস্বার্থভাবে স্বামীর খেদমতের জলন্ত ইতিহাস ---------- ৭০

ভূমিকা

আকায়েদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ্ এই তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম। ফিক্বাহ্ দুই ভাগে বিভক্ত-ইবাদত (আল্লাহর হক) মোয়ামালাত (সৃষ্টি জীবের হক)। তাছাওউফ দুই ভাগে বিভক্ত মুহলিকাত (আত্মার ধংসকারী কু-রিপু) মুন্‌জিয়াত (আত্মার পরিত্রাণকারী সৎগুণ)।

মোয়ামালাত বা সৃষ্টি জীবের হক মৌলিকভাবে দশ ভাগে বিভক্ত-উহার একটির নাম বিবাহ। মহান আল্লাহ্‌তায়ালা এই বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। দাম্পত্য জীবনের এ মহব্বত ও ভালবাসাকে অটুট রেখে সংসার জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সুখী হওয়ার জন্য উভয়েরই কতিপয় অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ও সচেষ্ট হতে হয়। যে সমস্ত স্বামী-স্ত্রী এ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ও অধিকার প্রদান করে সে সমস্ত স্বামী-স্ত্রী হয় সুখী। আর যে সমস্ত স্বামী-স্ত্রী এ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ও অধিকার প্রদানে অবহেলা করে তারাই হয় অসুখী।

অত্র বইখানাতে স্বামী-স্ত্রীর সুখী হওয়ার নীতিমালা লিপিবদ্ধ করে বইখানার নাম রাখা হল স্বামী-স্ত্রী সুখী হওয়ার নীতিমালা বা দাম্পত্য জীবনের অমূল্য রত্ন-১ম খন্ড।

-গ্রন্থকার

বিশেষ জরুরী বক্তব্য

মানুষ যখন সাবালেগ হয়, তখন বিবাহের আবশ্যক হয়। মানুষ পয়দা হওয়ার ছবব হইয়াছে বিবাহ। এই বিবাহের অছিলায় পরজগতে বেহেশ্‌ত ভবন হাছিল সহজ হইয়া যাইবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যে জিনিস যে কাজের জন্য পয়দা করিয়াছেন, সেই জিনিস সেই কাজে খরচ করার নাম শোক্‌র। আর সেই কাজে খরচ না করার নাম নাশুক্‌রী।

পুরুষের ভিতরে সন্তান পয়দা হওয়ার বীজ ও স্ত্রীলোকের ভিতরে সন্তান পয়দা হওয়ার ক্ষেত বা বাচ্চাদানী পয়দা করা হইয়াছে। এক্ষণে পুরুষ যদি বিবাহ না করে, তবে তাহার ভিতরের বীজ নষ্ট হইয়া যাইবে। আর মেয়েরা যদি বিবাহ না বসে তবে তাহাদের বাচ্চাদানী বেকার হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে বীজ এবং ক্ষেত পয়দা করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে। এই জন্যই বিবাহ করা ছুন্নাত হইয়াছে। যখন হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয় হয় তখন বিবাহ করা ফরয হইয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলার দীদারের এক বড় অছিলা হইয়াছে বিবাহ। হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাক পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার দীদার হাছিল করিতে চাহে সে যেন একটি নেককার মেয়ে লোক বিবাহ করে। মেয়েদেরও বিবাহের অছীলায় আল্লাহ্ তা'আলার দীদার হাছিল করা সহজ হইবে।

নেক্‌কার আওলাদের নিয়ত করিয়া বিবাহ করিতে হয়। সন্তান যদি ছোট শিশু অবস্থায় মারা যায় তবে এই সন্তান পিতা-মাতাকে হাশরের মাঠে শাফা'আত করিবে। যদি সন্তান আলেম হয়, আর ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করিতে থাকে, তবে এই আলেমের পিতা-মাতাকে হাশরের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে টুপি এবং রুমাল উপহার দেওয়া হইবে এবং আলেমদের শাফায়াতে নাজাত দান করা হইবে। পিতা-মাতা মৃত্যুর পর কবরে থাকিয়া নেক্‌কার আওলাদের পক্ষ হইতে দো'আ পাইতে থাকিবে।

সূরা আল্ ইমরানে আছে- হযরত যাকারিয়া (আঃ) সন্তানের জন্য দো'আ করিয়াছিলেন- "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে নেক সন্তান দান কর।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দো'আ কবুল করিয়া একটি নেক সন্তান দান করিয়াছিলেন- যাঁহার নাম হযরত এহ্‌ইয়া (আঃ)। প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের বিবাহের পরে নেক আওলাদের নিয়তে দো'আ পাঠ করা উচিত। তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা নেক সন্তান দান করিবেন।

মরিয়মের মাতা মান্নত করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ্ তা'আলা আমার গর্ভে যে সন্তান পয়দা হইবে, সেই সন্তান তোমার ইবাদতের জন্য আযাদ করিয়া দিলাম। আমার সেই সন্তান তোমার ইবাদতখানা বাইতুল মুকাদ্দাছের খেদমত করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দো'আ কবুল করিয়া মরিয়মকে দান করিলেন। উক্ত হযরত মরিয়মকে তাঁহার খালু যাকারিয়া (আঃ)- এর হেফাজতে রাখা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় তিনি সেই যামানার মেয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক মুছলমানের সন্তানদিগকে নেক্কার লোকদের হেফাজতে রাখা দরকার এবং সন্তানগুলি যাহাতে অসৎ সঙ্গ হইতে দূরে থাকে সেদিকে পিতা-মাতার দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরী।

বিবাহের সময় নেককার ছেলে-মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করান উচিত

হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন- হে যুবক সম্প্রদায়। তোমাদের শক্তি থাকিলে বিবাহ করিবে আর যদি শক্তি না থাকে তবে তোমরা রোযা রাখিবে। রোযাতে কিছু আত্মরক্ষার যোগাড় হইবে। শক্তির অর্থ বিবির মহরানার টাকা, খোর-পোষ, হাবেলী ইত্যাদি।

বর্তমানে মুছলমান সমাজ মহরানা ধার্য্য করাটা বুঝে, কিন্তু মহারানার টাকা আদায় করিয়া দেওয়াটা একরকম বুঝেই না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, বিবির সহিত রাত্রিবাস করার পরক্ষণে মহরের টাকা আদায় করিয়া দাও। কারণ পুরুষ তুমি তোমার টাকা দ্বারা ব্যবসা করিয়া টাকা উপার্জন করিতেছ, বিবিকেও তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া দাও। তুমি যেমন ঐ টাকা দ্বারা ইহজগত এবং পরজগতের উন্নতি সাধন করিতেছ, বিবিকেও তদ্রুপ ইহজগত এবং পরজগতের উন্নতি করিতে দাও। তুমি যেরূপ হজ্ব, যাকাত, ছদকায়ে ফিতর, কুরবানী এবং দ্বীন প্রচার কায়েমের জন্য মালী বন্দেগী ইত্যাদি ধর্মের কাজ করিতেছ, বিবিকেও তদ্রুপ করিতে দাও।

কতক বিবিরা মনে করেন, আমাদের খোর-পোষ যাবতীয় খরচ যখন স্বামী হইতে পাইতেছি তখন আর টাকা দিয়া কি করিব? এই ধারণা দ্বীনি ইল্মের অজ্ঞতা। মেয়েদের যদি টাকার দরকার না থাকিত তবে আল্লাহ্ তা'আলা মেয়েদিগকে পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নি, ছেলে-মেয়ে থেকে মিরাছ সম্পত্তির ভাগ দিতেন না।

পুরুষদের যেরূপ বহু টাকার দরকার মেয়েদেরও তদ্রুপ ইহজগতও পরজগত হাছিল করার জন্য বহু টাকার দরকার। পুরুষেরা যদি তাহার বিবিকে বেহেশ্ত ভূবনে নিয়া যাইতে চাহে, তবে তাহার কোন তহবিল নষ্ট

করা উচিত নহে বরং প্রত্যেক তহবিলের উন্নতিকল্পে সাহায্য করা উচিত এবং নিজের মালী, জেসমানী ও রুহানী বন্দেগীর সাথে তাহাকে শরীক রাখা উচিত। বিবির মহরানার টাকা বা তাহার অন্য কোন তহবিল হইতে একটি টাকাও আত্মসাত করিলে হিসাবান্তে দোযখ ভোগ করিতে হইবে।

বেগানা পুরুষের থেকে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এরূপভাবে হাবেলী তৈয়ার করিয়া দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। বিবির সাথে স্বামীর আলাপ-আলোচনা ও ব্যবহার করিবার জন্য পৃথক ঘর থাকা দরকার। শরীয়তের বিধান মতে চলাফিরার জন্য নছীহত করা দরকার। বিনা আইনে গালি-গালাজ, মারপিট করা মস্ত বড় গুনাহ।

মাত্র চারটি দোষের জন্য মারপিটের বিধান আছে

- ❑ **প্রথম- বিবি সাজ-সজ্জায় থাকিতে না চাহিলে।**
- ❑ **দ্বিতীয়- নামায না পড়ার কারণে।**
- ❑ **তৃতীয়- পর্দায় থাকিতে না চাহিলে।**
- ❑ **চতুর্থ- বিনা ওযরে ব্যবহার করিতে অস্বীকার করার কারণে।**

এই চারটি দোষ ছাড়া বিবিকে মারা নিষেধ। মাইরের জন্য স্থান নির্ধারিত আছে।

মুখমন্ডলে, মাথায়, বুকে, পৃষ্ঠদেশে, হাঁটুর নীচে মারা নিষেধ। শুধু কোমরের নীচে এবং হাঁটুর উপরে মাইরের বিধান রহিয়াছে। নির্দয়ভাবে মারা নিষেধ। বিনা আইনে মারিলে হাশর প্রান্তরে জালেম শ্রেণীভূক্ত হইয়া দোযখ ভোগ করিতে হইবে।

স্ত্রীর পক্ষেও স্বামীর কথার বাধ্য থাকা ও স্বামীর খেদমতে রত থাকা কর্তব্য এবং স্বামীর অন্তরে কোনরূপে কষ্ট দেওয়া উচিৎ নহে।

[শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম- লেখকঃ- নায়েবে রসুল, মুজাদ্দিদে আ'জম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রহঃ)]

আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন একটি সংসার কামনা করেন যে সংসারের স্ত্রী হবে ধার্মীক, স্বামী হবে ধার্মীক, সন্তানও হবে ধার্মীক

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর উদরে বিবি হাজেরার গর্ভে ইসমাইল (আঃ) জন্মগ্রহণের পর আল্লাহ্ আদেশ করলেন বিবি হাজেরা ও তার দুগ্ধ পোষ্য শিশু হযরত ইসমাইল (আঃ) কে বনবাসে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ্র আদেশ পেয়ে তিনি বিবি হাজেরাকে বললেন তোমার কয়েকদিন অন্য জায়গায় থাকতে হবে। তাই ইসমাইলকে নিয়ে প্রস্তুত হও।

ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে নিয়ে কিছু খাদ্য ও পানিসহ উষ্টে আরোহন করে মরুভূমির দিকে পথ চলতে শুরু করলেন। আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে পৌছলে ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী পুত্রসহ উষ্ট থেকে অবতরণ করলেন।

বিবি হাজেরা ইবরাহীম (আঃ) এর আচার-আচরণ ভাব-ভঙ্গিমা ও জামা খাঁচানোর অবস্থা দেখে বুঝে ফেললেন যে, তিনি তাদেরকে এই বালুকাময় মরু প্রান্তরে রেখে চলে যাবেন। তাই বিবি হাজেরা ইবরাহীম (আঃ) কে বললেন, আমি হলাম একজন যোদ্ধা ও যুবতি আর আপনি হলেন বৃদ্ধ কাজেই আপনি চলে যেতে চাইলেই যেতে পারবেন না। এমনকি দৌড় দিয়েও যেতে পারবেন না। তবে আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন তাহা হল আপনি কি আমাকে এই মরু প্রান্তরে আমার সতীন সারার কথা মত রেখে যাচ্ছেন, না আল্লাহর কথা মত। যদি সারার কথা মতই হয় তাহলে আপনি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবেন না। কারণ আপনি আমার সাথে শক্তিতেও পারিবেন না, দৌড়েও পারবেন না। সুতরাং কিভাবে যাবেন? আর যদি আল্লাহর কথা মতই হয়ে থাকে তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, কোন নবীই পারেনা এক স্ত্রীর কথা মত অন্য স্ত্রীকে বনবাসে দিতে। বরং এখানে আল্লাহরই নির্দেশ রয়েছে। খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে বিবি হাজেরা খুশী হয়ে বললেন– আল্লাহ্ যে পৃথিবীতে হাজার মহিলা ও সন্তান থাকতে আমাকে ও আমার সন্তানকে এই মরু প্রান্তরে রাখার জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন এটা আমার জন্য মহা সৌভাগ্য, যে প্রভু আমাদের এখানে রাখার জন্য বলেছেন, সে প্রভু আমাদের সকল কিছুর ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং আপনি চলে যেতে পারেন।

ইবরাহীম (আঃ) বিবি হাজেরার কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাদের জন্য দোয়া করে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে চলে আসলেন। তারা আসার সময় সাথে যে খাদ্য ও পানি এনে ছিলেন তাহা কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেল।

শিশু ইসমাইলকে শুধু বুকের দুধ পান করিয়ে রাখলেন। কিন্তু হাজেরাকে অভুক্ত থাকার কারণে বুকের দুধ ও শুকিয়ে গেল। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় হাজেরা একেবারে কাতর হয়ে পড়লেন। এমনকি পানির অভাবে শিশু ইসমাইলের দুই ঠোট ও জিহ্বাহ শুকিয়ে গেল।

তায়াককুলের আছবাব তৈরির জন্য পানির খোঁজে বিবি হাজেরা শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে একবার 'সাফা' পাহাড়ে উঠেন আবার শিশুর

কাছে ফিরে আসেন আবার পানির সন্ধানে 'মারওয়া' পাহাড়ে উঠেন, আবার শিশুর কাছে ফিরে আসেন। এভাবে ৭ বার 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে উঠা নামা করার পরও কোথাও পানির সন্ধান পেলেন না।

এ ঘটনাকে স্মরণীয় রাখার উদ্দেশ্যেই 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাত বার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজ্বের বিধি বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। বিবি হাজেরা দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে এসে দেখলেন, শিশুর পায়ের গোড়ালীর লাথির জায়গা দিয়ে পানির ঝর্ণা বহিতেছে। সাথে সাথে আল্লাহর শুকরিয়া হিসেবে পানি নিজে পান করলেন এবং শিশুকেও পান করালেন। প্রকাশ থাকে যে, ঐ পানির মধ্যে খাদ্যেরও গুণাগুন বিদ্যমান ছিল। যেভাবে পানি উঠতে ছিল বিবি হাজেরা দেখলেন এতে এই মরু অঞ্চল ডুবে যাবে, তাই তিনি পাথর দিয়ে একটি সীমানা দিয়ে বললেন ঝমঝম থাম থাম। ফলে পানি উঠা বন্ধ হয়ে গেল। বর্তমানে এই কুপের নামই ঝম ঝম কুপ।

হযরত ইসমাইল (আঃ) লালিত পালিত হয়ে বড় হয়ে উঠলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এভাবে আসতে আসতে ইসমাইল, ইবরাহীম (আঃ) এর কাছে প্রিয় বস্তুতে পরিনত হল।

এমন পরিস্থিতে ইবরাহীম (আঃ) গভীর ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখলেন আল্লাহ স্বয়ং বলছেন, হে ইবরাহীম তুমি আমার নামে তোমার প্রিয় বস্তুকে কোরবাণী কর।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দুইশত উট ছিল। স্বপ্ন দেখার পর দিন ভোরে তিনি আল্লাহর নামে একশত উট কোরবাণী করে দিলেন।

আবারও তিনি স্বপ্নে দেখলেন– আল্লাহ বলছেন, হে ইবরাহীম তুমি আমার নামে তোমার প্রিয় বস্তুকে কোরবাণী কর। এবারে তিনি তার বাকী একশত উটও আল্লাহর নামে কোরবাণী করে দিলেন। কিন্তু আল্লাহর কি কুদরত তিনি পুনরায় স্বপ্নে দেখলেন আল্লাহ বলতেছেন, হে ইবরাহীম তুমি তোমার সর্বাধিক প্রিয় বস্তু আমার নামে কোরবাণী কর। এবারে তিনি স্বপ্নে ইঙ্গিত পেলেন তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বস্তু ছেলে ইসমাইল (আঃ) কে কোরবাণী করার জন্য বলা হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, নবীদের স্বপ্ন হল অহী। আরো প্রকাশ থাকে যে, তখন মানুষ কোরবাণী দেওয়া জায়েয ছিল।

ইবরাহীম (আঃ) বুঝলেন আল্লাহ্ আমার হৃদয়ের ধনের কোরবাণী চাচ্ছেন। তাই তিনি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য হাজেরাকে বললেন ইসমাইল আমার সাথে কিছুদিন থাকবে। বিবি হাজেরাও চিন্তা করলেন ইসমাইল হবেন পরবর্তী নবী। তাই এখন থেকেই বাবার সাথে থেকে সবকিছুই শিক্ষা করে লওয়া উচিত। সুতরাং বিবি হাজেরা ও ইসমাইলকে বাবার সাথে রাখতে রাজী হলেন।

ইবরাহীম (আঃ) বাজারে গিয়ে বাজার থেকে ইসমাইল ও তার মায়ের জন্য নতুন জামাকাপড় ও খুব ধারালো একটি ছুড়ি বানিয়ে আনলেন। বিবি হাজেরার রান্নার কাজ সমাপ্ত হলে ইবরাহীম (আঃ) বললেন, চলেন আমরা ইসমাইলকে গোসল করায়ে নিয়ে এসে আজকে একত্রে খানা খাব।

গোসল করানোর পরে হাজেরাকে বললেন আপনিও নতুন কাপড় পড়েন। ইসমাইলকেও নতুন জামা কাপড় পড়ান। এরপর তারা একত্রে খেতে বসলেন। ইবরাহীম (আঃ) ছেলেকে বললেন তোমার মায়ের মুখে লোকমা তুলে দাও, বিবি হাজেরাকেও বলেন ছেলের মুখে লোকমা তুলে দিন। যাতে বিবি হাজেরার মনে কষ্ট না থাকে যে, ছেলের হাতের লোকমা খেতে পারলামনা। ছেলেকেও লোকমা খাওয়াতে পারলাম না। এভাবে করতে দেখে বিবি হাজেরা বললেন আপনি এভাবে করেন কেন? তিনি বললেন ছেলে আমার সাথে চলে যাবে কখন আবার আসবে বলা তো আর যায় না। এ কথা শুনে বিবি হাজেরা বললেন যে, ছেলে তো ইনশাআল্লাহ ফিরে আসবে। ইবরাহীম (আঃ) বললেন হায়াত মৌয়াতের তো আর টাইম নাই। বিবি হাজেরা ছেলেকে বললেন তোমার বাবার মুখেও লোকমা তুলে দাও। ইবরাহীম (আঃ) কে বললেন আপনিও ছেলের মুখে লোকমা তুলে দিন। এভাবে খাওয়া-দাওয়া শেষ হল।

এরপর বিবি হাজেরাকে বললেন ছেলেকে সাজিয়ে আমার সাথে রওয়ানা করে দাও। বিবি হাজেরাও অত্যন্ত খুশী হলেন বাবার সাথে থাকবে নবুয়াতী কাজ শেখবে।

বিবি হাজেরা ছেলেকে সুন্দর পোষাক পড়িয়ে দিয়ে বাবার সাথে রওয়ানা করে দিলেন। যাওয়ার সময় ইবরাহীম (আঃ) ছেলেকে বললেন তোমার মাকে ছালাম কর। আর হাজেরাকে বললেন, ছেলেকে দোয়া করে দাও। তারা রওয়ানা হয়ে চলে গেলেন।

পিতা-পুত্র বিবি হাজেরা খোদার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিরাট মর্যাদাশীল হবে। এটা ইবলীশ সহ্য করতে পারলনা। ইবলিশ দরবেশ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করে হাজেরার নিকট এসে উপস্থিত হল এবং বলতে লাগল, তুমি আমায় চিনবেনা, আমি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে মহান প্রভুর

ধ্যানে মগ্ন আছি। তোমার স্বামী ইবরাহীম আমাকে ভাল ভাবেই জানে। তার সাথে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, সে তাঁর সকল কথাই আমার নিকট বলে। আজ সকালে সে আমার নিকট একটি কথা বলেছে, উহা যেমন মর্মান্তিক তেমনি ভীষণ। কথাটি শোনা মাত্র তাকে আমি নানাভাবে বারণ করলাম কিন্তু সে আমার কোন কথাই শুনল না। বাধ্য হয়ে তাই কথাটি তোমার কাছে বলার জন্য ছুটে এসেছি।

হাজেরা বললেন, কি এমন কথা বলুন তো শুনি। শয়তান বলল-তা প্রকাশ করতে আমার কলিজা ছিড়ে যাচ্ছে। না জানি শুনে তোমার কি অবস্থা হয়। কিন্তু না বলেওতো উপায় নেই। শোন তোমার স্বামী যে ইসমাইলকে সাথে রাখার কথা বলে নিয়ে গেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। বরং তোমার স্বামী তোমার সতীনের কথা মতো তোমার ছেলে ইসমাইলকে জবাই দেওয়ার জন্য মিনা প্রান্তরে নিয়ে যাচ্ছে। বিবি হাজেরা বললেন কোন নবীই পারেনা এক স্ত্রীর কথা মত অন্য স্ত্রীর ছেলেকে জবাই দিতে। ইবলিশ এতে বিফল হওয়ার পর আসল ঘটনা খুলে বলল যে, তোমার স্বামী আল্লাহর নির্দেশে ইসমাইলকে কোরবাণী দেওয়ার জন্য মিনা প্রান্তরে নিয়ে যাচ্ছে। বিবি হাজেরা ইতিমধ্যে দেখলেন যে, এই দরবেশ ভিক্ষুকের কোন ছায়া নেই। ফলে বিবি হাজেরা বুঝতে পারলেন যে, ইনি অবশ্যই ইবলিশ শয়তান। তাই বিবি হাজেরা জোরে ইবলিশকে লক্ষ্য করে বললেন- লা-হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ধমকের সাথে বলতে লাগলেন তুই শয়তান আমাকে ধোকা দিতে এসেছিস, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যা, আর শোন তুই যা বললি তা সত্য হলে দুনিয়ায় আমার মতো সৌভাগ্যবতী নারী দ্বিতীয়টি কে আছে বল্? আর আমার পুত্র আল্লাহর নামে কোরবাণী হবে এর চেয়ে পরম গৌরব আর সম্মানের বিষয় কি থাকতে পারে? দুনিয়ার শত শত ছেলের মধ্য থেকে আল্লাহ যে আমার ছেলেকে কোরবাণীর জন্য পছন্দ করেছে এর চেয়ে সুনসীব আবার কি থাকতে পারে? তুই আমার দৃষ্টির সীমানা থেকে দুরে চলে যা।

ইবলিশ তার চেষ্টায় বিফল হয়ে গেল দেখে আর সেখানে এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না। এবার ইবলিশ মিনার পথে ইসমাইলকে ধোকা দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে বলল তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমাকে তো তোমার আব্বু তোমার সৎ মায়ের কথা মত মিনা প্রান্তরে জবাই করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। ইহা শুনে ইসমাইল বলল আব্বু ইনি কি বলে? ইবরাহীম (আঃ) চেয়ে তাকে আর না দেখে বুঝলেন ইনি শয়তানই হবে। তাই ইবরাহীম (আঃ) বললেন পাথর নিক্ষেপ কর। পাথর নিক্ষেপ করার পর সে অদৃশ্য হয়ে

গেল। আবার কিছু দুর যাওয়ার পর ইবলিশ মিয়া ইসমাইল (আঃ) এর কাছে গিয়ে ঐ একই কথা বলল। ইসমাইল বলল আব্বু ইনি আবার কি বলে? ইবরাহীম (আঃ) বললেন আবারও পাথর নিক্ষেপ কর। পাথর নিক্ষেপের পর এবারেও সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার কিছু দুর যাওয়ার পর ইবলিশ বলল হে ইসমাইল তোমাকে যে তোমার আব্বু তোমার সৎ মায়ের কথা মতো জবাই করতে নিয়ে যাচ্ছে তা তুমি বিশ্বাস কর না কেন? তুমি ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখ তোমাকে জবাই করার ছুরি এবং তোমাকে বাঁধার জন্য দড়িও তোমার আব্বুর জীবে রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, শয়তান ইবরাহীম (আঃ) এর জীবের ছুরি এবং দড়ি ইসমাইলকে দেখানোর জন্য জীবের ভিতর থেকে জাগিয়ে ধরেছিল। এবারেও পাথর মেরে ইবলিশকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। এ ঘটনাকে স্মরণীয় রাখার উদ্দ্যেশেই মিনায় তিন বার কংকর নিক্ষেপ করা কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজ্বের বিধি বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। এবার ইবলিশের কথা গুলো শুনে ইসমাইল বলল আব্বু আপনি যদি আমার সৎ মায়ের কথামত আমাকে জবাই করতে না নেন, তাহলে আপনার জীবে ছুরি এবং দড়ি কেন? ইবরাহীম (আঃ) বলল হে আমার হৃদয়ের ধন জেনে রাখ কোন নবীই পারেনা তার স্ত্রীর কথা মত সন্তানকে জবাই করতে। বরং আমি আল্লাহর নির্দেশ মতই তোমাকে কোরবাণী করতে নিয়ে যাচ্ছি। এ কথা শুনে ইসমাইল বলল পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষের ভিতর থেকে আল্লাহ্ যে আমাকে কোরবাণী করার জন্য পছন্দ করেছেন এর চেয়ে সুন-সীব আমার আর কিছুই থাকতে পারে না। সুতরাং আপনি প্রভুর আদেশ পালন করুন। আমাকে অবশ্যই আপনি ধৈর্য্যশীল রূপে দেখতে পাবেন।

পুত্রের কথা শুনে ইবরাহীম (আঃ) আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে খোদার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বলতে লাগলেন, প্রভু তুমি আমায় সত্যিই স্বার্থক সন্তান দান করেছ। এমন পুত্র লাভ করে আমার জীবন ধন্য হল। ইতিমধ্যে তারা আল্লাহর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তর কোরবাণী গাহে পৌছলেন। তখন ইসমাইল (আঃ) পিতাকে বললেন, জবেহ দেওয়ার সময় আমার হাত-পা আপনার শরীরে লাগতে পারে ইহাতে বেয়াদবী হবে। তাই আপনি আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশী ছটফট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পরে। রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন, আপনার ছুরিটাও ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ মৃত্যু বড়

কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তার কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা শান্ত হবেন।

পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে, কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। ইবরাহীম (আঃ) বললেন হে বৎস! আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ।

ইসমাইল (আঃ) এর হাত-পা বেঁধে কাত করে মাটিতে শুয়ায়ে তিনি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার ইসমাইলের গলায় একটুও দাগ কাটতে পারলনা। কি ব্যাপার! ইবরাহীম ছুরিখানার ধার পরীক্ষা করে দেখলেন তাতে হীরকের মত ধার। তবে কাটতেছেনা কেন? পুনরায় তিনি বিসমিল্লাহ বলে ছুরি চালাতে লাগলেন কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার তীক্ষ্ণ ধার সম্পন্ন ছুরিখানা ইসমাইলের গলায় একটুকুও আচর পর্যন্ত কাটতে পারলনা। এবার তিনি তার দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ছুরি চালাতে লাগলেন। তবুও ইসমাইলের গলার একটা পশমও কাটলনা। ইবরাহীম অতিশয় রাগান্বিত হয়ে ছুরিখানা একখন্ড পাথরের উপর ছুড়ে মারলেন আর তাতে পাথরখানা কেটে দু'টুকরা হয়ে গেল। কি আশ্চর্য ব্যাপার ছুরির ধারে পাথর কেটে দু'টুকরো হতে পারে অথচ রক্ত মাংসের গড়া একটা কোমল দেহ সে কাটতে পারলনা।

পুনরায় তিনি ছুরিখানা উঠিয়ে হাতে নিলেন। তখন ইসমাইল বললেন, হে আব্বু হয়ত আপনি আমার প্রতি মায়ার কারণে হাতে জোর পাচ্ছেন না। তাই আপনার চক্ষুদ্বয় কাপড় দ্বারা বেঁধে নিন। যাতে আমার মুখের উপর আপনার দৃষ্টি না পড়ে। মনে হয় এরূপ করলে আপনি সফল হতে পারবেন। পুত্রের কথা শুনে ইবরাহীম (আঃ) ভাবলেন ইসমাইল হয়তো ঠিক কথাই বলেছে। আমি হয়তো পুত্র স্নেহে ঠিক মত ছুরি চালাতে পারছিনা। নতুবা এমন তীক্ষ্ণ ধার থাকা সত্ত্বেও ছুরি দ্বারা আমি তার গলায় একটুকুও আচর পর্যন্ত লাগাতে পারলামনা কেন? দেখিই না চোখ বেঁধে, কিছু করতে পারি কিনা। অতএব একটি কাপড় সাত ভাজ করে তিনি নিজের হাতে চোখ দু'টোকে উত্তম রূপে বেঁধে পুনরায় ছুরি চালাতে বসে গেলেন ইতোমধ্যে আল্লাহর আদেশে ফেরেস্তা জিবরাইল এসে ইসমাইলকে সরিয়ে নিয়ে তার পরিবর্তে সেখানে একটা দুম্বা রেখে দিলেন। ইবরাহীম (আঃ) বিসমিল্লাহ বলে ছুরি চালিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গলা কেটে গেল। ইবরাহীম (আঃ) এর দু'চোখের পানিতে সাত পল্টি

কাপড় ভেজে পানি নীচে পড়তেছে। চোখের বাঁধন খুলে দেখলেন ইসমাইল (আঃ) পাশে দাঁড়ানো, দুম্বা জবাই হয়ে গেছে। তখন জিবরাইল (আঃ) বললেন- আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ইবরাহীম (আঃ) বললেন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, ইসমাইল (আঃ) বললেন- ওয়া লিল্লাহিল হামদ। উপর থেকে আওয়াজ হল হে ইবরাহীম আল্লাহ্ তোমার কোরবাণী কবুল করে নিয়েছেন।

উপরের বিবরণে দেখা যায় যেভাবে ইবরাহীম (আঃ) ধার্মীক ছিলেন সেভাবে ধার্মীক ছিল তার স্ত্রী বিবি হাজেরা, সেভাবে ধার্মীক ছিল তাদের সন্তান ইসমাইল (আঃ)। সুতরাং আল্লাহ্ এমন একটি সংসার কামনা করেন যে সংসারের স্বামী হবে ধার্মীক, স্ত্রী হবে ধার্মীক এবং সন্তান হবে ধার্মীক, তাহলেই সে সংসারটা হবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী সুখী সংসার।

আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে একমাত্র বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর এই বন্দেগী হল তিন ভাগ এবাদতে জেছমানী, এবাদতে রূহানী ও এবাদতে মালী। তাই প্রত্যেক স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তান যদি একজন নায়েবে রাসূল গ্রহণ করে তার কাছ থেকে এবাদতে জেছমানী তথা ফিকাহের এবাদত ও মোয়ামালাতের মাছয়ালাগুলো সঠিকভাবে শিক্ষা ও আমল করে, এবাদতে রূহানী তথা ইলমে তাছাওউফের মুহলিকাত ও মুনজিয়াতের মাছয়ালাগুলো সঠিকভাবে শিক্ষা ও আমল করে এবং মালী বন্দেগীর ধারাগুলো সঠিকভাবে শিক্ষা করে আল্লাহর বিধান মত মাল তিন ধারায় তথা সংসারের জরুরী কাজে, গরীবের অভাব মোচনের জন্য ও ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম বিস্তারের জন্য ব্যয় করে তাহলে স্ত্রীও হবে সুখী, স্বামীও সুখী হবে এবং সন্তানও সুখী হবে। আর ঐ সংসারটা হবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সংসার।

বর্ণিত বিবরণে আরো দেখা যায় যে, ছেলে কতদুর বাবা ভক্ত ছিল যে, বাবা যখন বলল যে আল্লাহ্ তোমাকে কোরবাণী দেওয়ার জন্য বলেছে। তা ছেলে সাথে সাথে মেনে নিল। কারণ ছেলে চিন্তা করল বাবা কোন দিনই সন্তানদের অকল্যাণ চান না।

বাবা যখন সন্তানদের অকল্যান চাননা তখন সকল সন্তানদেরই উচিত শরীয়ত সম্মত কাজে বাবা-মার কথামত চলা। আর বাবা-মারও উচিত সন্তানকে এমনভাবে ছোট বেলা থেকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যাতে সন্তানগণ আল্লাহ্ , রাসুল তথা ধর্মীয় সকল নির্দেশ ও বাবা-মার কথা শুনতে বাধ্য হয়।

বর্ণিত বিবরণে আরো দেখা যায় যে, স্ত্রী হাজেরাকে যখন ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ মত বনবাসে থাকার কথা বললেন, তখন তিনি তা সাথে সাথে মেনে নিলেন। কারণ তিনি চিন্তা করলেন স্বামী কোনদিনই স্ত্রীর অকল্যাণ চান না।

স্বামী যখন স্ত্রীর অকল্যাণ চাননা তখন সকল স্ত্রীরই উচিত শরীয়ত সম্মত কাজে স্বামীর কথা মত চলা। আর স্বামীরও উচিত বিবাহের শুরু থেকেই স্ত্রীকে এমনভাবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যাতে স্ত্রী আল্লাহ্, রাসুল তথা ধর্মীয় সকল নির্দেশ ও স্বামীর কথা শুনতে বাধ্য হয়।

মোট কথা যে ভাবে সংসারের বাবা ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর বিধান পালনের জন্য ছেলে ও স্ত্রীকে বনবাসে দিতে ও ছেলেকে কোরবাণী করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। আর সংসারের স্ত্রী বিবি হাজেরা বনবাসে থাকতে ও ছেলেকে কোরবাণীর ব্যাপারে কোন আপত্তি তুলেনি বরং খুশি হয়েছেন। সংসারের সন্তান ইসমাইল নিজেকে কোরবাণী করার ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি না করে বরং খুশি হয়েছেন এবং বাবাকে সহজে কোরবাণী করার পথ শিখিয়ে দিয়েছেন। সেভাবেই প্রতিটি সংসারের বাবা-স্ত্রী ও সন্তানদের আল্লাহর বিধান পালনের ব্যাপারে মনোযোগী ও সচেষ্ট থাকতে হবে। তবেই আল্লাহ ঐ সংসারের প্রতি খুশি হবেন। আর আল্লাহ্ এমনই একটি সংসার কামনা করেন। প্রকাশ থাকে যে, শরীয়ত সম্মত বেলায় স্ত্রী স্বামীর কথা মত চলবে, সন্তান মা-বাবার কথামত চলবে, এটাও আল্লাহর বিধান।

পর্দা স্বামী-স্ত্রীর সুখী হওয়ার একটি বিরাট হাতিয়ার

হযরত ইমরানের স্ত্রী হযরত হান্না ছিলেন নিঃসন্তান। তাই স্বামী-স্ত্রী সবর্দা নতশীরে আল্লাহর কাছে আকুল প্রার্থনা করতেন সন্তানের জন্য। আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করলেন। হযরত হান্না মান্নত করলেন আমার গর্ভে যে সন্তান হবে তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য দিব।

হযরত হান্নার কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। ফলে হযরত হান্না বললেন আমি তো আমার সন্তানকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য মান্নত করেছি। কিন্তু তাতো কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ বললেন এই কন্যার মতো কোন পুত্রই যে নাই। আল্লাহ্ তার নাম রাখলেন মরিয়ম।

যাহা হোক এই কন্যা সন্তান মরিয়মকে মান্নত অনুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এখন মরিয়মের লালন পালনের দায়িত্ব

কে নিবে? মরিয়মের বংশবলী ও সৌন্দর্যের দিক বিবেচনা করে সকলেই মরিয়মের লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে চায়। নামাজের পর এ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। কে নিবে মরিয়মের লালন পালনের দায়িত্ব। সবাই নিতে চায়। কাকে দেওয়া হবে? জনৈক এক মুছুল্লী বললেন আপনারা বিষয়টা নিয়ে মস্‌জিদের বাহিরে গিয়া আলোচনা করেন।

এ কথা বলার কারণে সবাই মিলে তাকেই ধরলো আপনিই ইহার একটি সমাধান দিন। ইহাতে তিনি সমস্যায় পরে গেলেন। সুতরাং তিনি এর সমাধানের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি বললেন যারা যারা মরিয়মের লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে চান তারা নদীতে খাকের কলম যে কলম দ্বারা তওরাত লিখা হত সে কলম নিক্ষেপ করবে। যার কলম স্রোতের উল্টো ভেসে আসবে সে মরিয়মের দায়িত্ব নিবে। সকলে ইহা মেনে নিল। সুতরাং তাই করা হল। ইহাতে হযরত জাকারিয়া (আঃ) এর কলম উল্টো ভেসে আসে। ফলে সর্বসম্মতভাবে হযরত জাকারিয়া (আঃ) মরিয়মের লালন-পালন করতে থাকেন। মরিয়ম আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল। হঠাৎ একদিন এক লোক মরিয়মকে দেখে বলল এই মেয়ের যে চেহারা তাতে কত যুবকের মনই না জানি এর প্রতি খারাপ হয়। ইহা শুনে হযরত জাকারিয়া (আঃ) চিন্তা করলেন এখনই যখন এই মেয়ের প্রতি মানুষের নজর পড়েছে ভবিষ্যতে আরো সমস্যা হতে পারে। ইহা ভেবে তিনি মরিয়মের জন্য মেহরবের সাথেই একটি রুম করে তার মধ্যেই পায়খানা প্রসাব ও গোসলের ব্যবস্থা করলেন। জাকারিয়া (আঃ) সময়মত খানা দিয়া আসতেন। রুমটি সর্বদা বাহির থেকে তালা দিয়ে রাখতেন। যাতে রুমের মধ্যে কোন পুরুষ ঢুকতে না পারে।

কিছুদিন এভাবে যেতে না যেতেই মরিয়মের জন্য তার খালা যে খানা বাটিতে পাঠাতো তাহা সেভাবেই ফেরত যেত। ইহা দেখে তার খালা তার খালুকে বলল দেখিয়েনতো মরিয়মের কি হয়েছে? কয়েকদিন যাবত খানা যেভাবে পাঠাই সে ভাবেই ফেরত আসতেছে।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) খানা ফেরতের কারণ জানার জন্য মরিয়মের রুমে ঢুকে কতগুলো বেমৌসুমী ফল দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং মরিয়মকে বলল এসব এলো কোথা থেকে? মরিয়ম বলল এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) ছিলেন নিঃসন্তানী। তিনি চিন্তা করলেন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ফলের মৌসুম ছাড়াই ফল দিতে পারেন, তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকেও হয়ত সন্তান দিবেন। তিনি বিষয়টি স্ত্রীর সাথে আলোচনা

করলেন। স্ত্রী বললেন আমার দীর্ঘদিন যাবত একটা ইচ্ছা যে, সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব। কিন্তু আপনার অনুমতি না পেলে দোয়া করি কিভাবে? তিনি বললেন সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। তাতেও আবার আমার অনুমতি লাগে? যাহাহোক তিনি দোয়া করার অনুমতি দিলেন।

আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকলেন। হে আল্লাহ্ তোমার নিকট থেকে আমাকে পুতঃপবিত্র সন্তান দান কর। তুমি তো আমাদের দোয়া শ্রবণকারী। একদিন তাদের দোয়া কবুল হল। হযরত জাকারিয়া (আঃ) কামরার ভিতরে নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ফেরেশ্‌তা তাকে ডেকে বললেন তোমার একটি সন্তান হবে তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া। হযরত জাকারিয়া (আঃ) বললেন হে আল্লাহ্ কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে। আমি হলাম বৃদ্ধ আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি বললেন আল্লাহ্ এমনিভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। তিনি বললেন হে আল্লাহ্ আমার মনের তৃপ্তির জন্য কিছু নিদর্শন দাও। আল্লাহ্ বললেন নিদর্শন হল তিনদিন পর্যন্ত তুমি মানুষের সাথে ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে সমর্থ হবে না।

সময়মত যাকারিয়া (আঃ) এর ঘরে জন্ম নিলেন হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)। খালাত ভাই জন্ম হওয়ার সংবাদ মরিয়মের কাছে পৌছল। কিন্তু খালু বৃদ্ধ খালা বন্ধ্যা এমতাবস্থায় সন্তান হওয়াটা মরিয়মের কাছে আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল।

তাই মরিয়ম একদিন তার রুমের গোসল খানায় গোসল করতে ছিলেন। হঠাৎ রুমে এক যুবক দেখতে পেলেন। ইহাতে তিনি আশ্চর্য হয়ে-চমকে উঠলেন ইনি আবার কে? সে বলল আমি হলাম আল্লাহর পক্ষের ফেরেস্তা। আমি আসছি আপনাকে একটি সুসংবাদ দেওয়ার জন্য। আর তা হল আপনার একটি সন্তান হবে। তার নাম হবে ঈসা। ইহা বলে ফেরেশ্‌তা একটি ফুৎকার দিলেন মরিয়ম মনে করল ফুৎকারটি যেন তার মুখ দিয়া পেটের মধ্যে চলে গেছে। মরিয়ম বললেন কেমন করে আমার সন্তান হবে? আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি? তিনি বললেন এভাবেই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে হয়ে যাও অমনি তা হয়ে যায়। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে মরিয়মের গর্ভ ধারণের কথা আস্তে আস্তে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। সকলেই ভীষণ ক্ষিপ্ত হল। কি আশ্চর্য ব্যাপার আল্লাহর ঘর বায়তুল মোকাদ্দাসের পাশে বসে এই ধরনের কাজ?

ইহা বরদাশ্‌ত করা হবে না। ইহার বিচার হতেই হবে। কেউ বলল বড় লোকে অন্যায় করলে তার বিচার হয় না। কেউ বললো শুধু মরিয়মেরই বিচার হবে না। যে এই অপকর্ম করেছে সে পুরুষেরও বিচার হতে হবে। কেউ বলল মরিয়মের গর্ভের সন্তানতো নির্দোষী তাই গর্ভ খালাসের পর বিচার করা হবে। কেউ বলল বিচার পরে হোক কিন্তু তাকে রুমে শান্তিতে থাকতে দেওয়া যাবে না। শাস্তি স্বরূপ বাহিরে রাখতে হবে। এভাবে বিভিন্ন বাজে কথা বার্তার পর মরিয়মকে রুম থেকে মাঠে একটি শুকনা খেজুর গাছের নিচে রাখা হয়। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে। মারে আল্লাহ রাখে কে। ফেরেশতা এসে বলল আপনার পেটে ক্ষুধা লাগলে এই শুকনা খেজুর গাছেই নাড়া দিবেন দেখবেন পাকা খেজুর পরতে থাকবে তাহা আহার করবেন। আর পানির প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছে চাবেন তাহলে মরুভূমি থেকে পানি উঠবে সেই পানি ব্যবহার ও পান করবেন। এভাবে কিছু দিন যাওয়ার পর মরিয়মের গর্ভ খালাস হল। ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করলেন। ফেরেশ্‌তা এসে বলল আপনার কাছে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আপনার ছেলের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলবেন।

যাহা হোক মরিয়মের গর্ভ খালাসের খবর প্রকাশ হবার পর সকলে মরিয়মের বিচার করার জন্য আসল, মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ছেলের পিতা কে? মরিয়ম বললেন ছেলের কাছে জিজ্ঞাসা করুন। তারা বলল শিশুরা কি কথা বলতে পারে? মরিয়ম বললেন জিজ্ঞাসা করে দেখুন না? ঈসা (আঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমার পিতা কে? ঈসা (আঃ) জবাব দিলেন আমি বিনা বাপে তোমাদের জন্য নবী হিসেবে দুনিয়াতে এসেছি। তারা বলল বিনা বাপে কি কেউ দুনিয়াতে আসতে পারে? ঈসা (আঃ) বললেন তা হলে তোমরা বল আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ) এর মা -বাপ কে? তারা বলল তুমি কি জান না? আল্লাহতায়ালা কুদরতি ভাবে সর্বপ্রথম প্রত্যেক জিনিস পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তারপর যারা পৃথিবীতে আসছে তারা সকলেই তো পিতা-মাতার মাধ্যমে আসছে। ঈসা (আঃ) বললেন ও তাই? তাহলে তোমরা, আমার হাতে কিছু মাটি দাও। তারা হাতে মাটি দিল। তিনি মাটি হাতে নাড়াচাড়া করে মাটিতে ফুঁক দিলেন অমনি পাখি হয়ে উঁড়ে গেল। এবার ঈসা (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা বল এবার এই পাখির মা এবং বাব কারা? তারা লা-জবাব।

ঈসা (আঃ) বললেন আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধকেও ভাল করতে পারি। জন্মান্ধ আনা হল ঈসা (আঃ) হাত বুলিয়ে দিলেন আর অমনি ভাল

হয়ে গেল। তিনি আরো বললেন, তোমরা যা খেয়ে এসেছো এবং যা ঘরে রেখে আসিয়াছ তা আমি বলতে পারি। ঈসা (আঃ) একজনকে বললেন তুমি আজকে মাছের লেজ খেয়েছ। মাঝের মাছ খেয়েছে তোমার ভাই। মাথা রেখেছো তোমার মায়ের জন্য। যেয়ে দেখো তা বিড়ালে খেয়েছে। বাড়ি গিয়ে দেখল তাই।

সকলে বলা বলি করতে লাগল যে ছেলের ছেলে মনে হয় মরা মানুষও জীবিত করতে পারে। ঈসা (আঃ) বললেন হ্যাঁ পারিইতো। তাকে একটি কবরের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি বললেন হে কবরবাসী আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে যাও। অমনি জীবিত হয়ে গেল। সকলের দেখার পর বললেন যেমন ছিলা তেমন হয়ে যাও। তাই হয়ে গেল। এখন সকলেই সকলের আত্মীয় স্বজনদের দেখার জন্য আগ্রহী। কিন্তু তিনি বললেন আমার মাকে বল মা আমাকে বললে আমি দেখাব। এতদিন যারা মরিয়মের বিচার করতে চেয়ে ছিল তারা এখন মরিয়মের বিচার করবে তো দুরের কথা বরং এখন তারা তাদের আত্মীয় স্বজনদের দেখার জন্য তার পা ধরাধরি শুরু করল। ঈসা (আঃ) ও মা যাকে জীবিত করার জন্য বলতেন তাকেই জীবিত করতেন।

হঠাৎ একজনের মনে পড়লো যে ওখানে আদম (আঃ) এর নাতির কবর আছে দেখি তাকে জীবিত করতে পারে কিনা? ঈসা (আঃ) কে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি বললেন আল্লাহর হুকুমে জীবত হও আর জীবিত হল। আবার যেমন ছিল তেমন হয়ে গেল।

বর্ণিত বিবরণে দেখা যায় যে, মরিয়ম (আঃ) পর্দায় থাকার কারণে দুনিয়াতে বেহেশ্‌তি ফল পেয়েছেন এবং দুনিয়ায় সম্মানিত ও সুখী হয়েছেন। সুতরাং বৈবাহিক জীবনে যদি যথাযথভাবে পর্দার আইন মেনে চলা হয় তাহলে স্বামী ও স্ত্রী উভয় সুখী হবেন।

পর্দা না থাকলে ঘরে রহমতের ফেরেস্তা থাকেনা

নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে আগুনের কুন্ডলীতে ফালাবার জন্য চরক গাছ তৈরি করে তাতে ইবরাহীম (আঃ) কে উঠানোর পর সবাই মিলেও চরক গাছ জাগাইতে পারছিল না। এক পর্যায়ে নমরুদ যখন হতাশ হল তখন ইবলিশ শয়তান মানুষের সুরত ধরে নমরুদের কাছে এসে বলল তুমি হলা ছোট শয়তান, আর আমি হলাম বড় শয়তান। ইবরাহীমকে আগুনে ফালাতে পারবানা। কারণ ইবরাহীমকে যে চরকে উঠানো হয়েছে তাতে রহমতের ফেরেস্তা বসে রয়েছে। তাই রহমতের ফেরেস্তাদেরকে

সরাইতে হলে এখানে যুবক-যুবতীদের এনে অবৈধ কাজ করাতে হবে। তাহলে রহমতের ফেরেস্তারা চলে যাবে চরক গাছ হালকা হয়ে যাবে ফলে ইবরাহীম (আঃ) কেও আগুনের কুন্ডলীতে ফালানো সম্ভব হবে। শয়তানের কথা মতো নমরুদ যুবক-যুবতীদের এনে অবৈধ কাজ করাল। ফলে রহমতের ফেরেস্তারাও চলে গেল। চরক গাছও হালকা হল। সুতরাং তারা সহজেই ইবরাহীম (আঃ) কে কুন্ডলীতে ফালাতে সক্ষম হল।

বর্ণিত বিবরণে বুঝা যায় যে, যে সমস্ত ঘরে সঠিক পর্দা নেই সে সমস্ত ঘরে রহমতের ফেরেস্তাও নেই। আর যেখানে রহমতের ফেরেস্তা নেই সেখানে সুখের আশা করাই বা যায় কিভাবে? সুতরাং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সুখী হওয়ার জন্য যে সমস্ত কাজ করতে হয় তার মধ্যে সঠিক পর্দার ব্যবস্থা করাও অন্যতম।

তাই জনাব মাওলানা কেরামত আলী সাহেব "তাজকিয়াতুন্নেছা" নামক কিতাবে লিখিয়াছেন-

তাওয়াজ্জুহ তা'লীম আমি যত করিলাম,
আছর না হয় কিছু ভাবে বুঝিলাম,
ইলহাম হইল দেলে নাচিজের এমন
বেপর্দা দাইউছের জন্য বেহুদা খাটন।

আল্লাহ ব্যতিত কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে সে সিজদা পেত স্বামী

স্বামীগন মর্তবার দিক দিয়া স্ত্রীদের কাছে এতবেশী যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন:- এক মানুষের জন্য যদি অন্য মানুষের সিজদা করা জায়েয হত, তাহলে স্ত্রীকে বলা হত তার স্বামীকে সিজদা করতে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা হারাম বিধায় এ হুকুম দেওয়া হয়নি।

এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, স্বামীর মর্যাদা স্ত্রীর নিকট অনেক বেশী। সুতরাং স্ত্রীদের উচিৎ স্বামীদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া।

স্ত্রী সর্বদা স্বামীর আদেশ পালন করবে

সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি ভক্তি ও মহব্বত পোষণ করা স্ত্রীর নৈতিক কর্তব্য। স্বামীর আদেশ মেনে চলা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। স্বামীর ডাকে তাৎক্ষনিকভাবে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর উচিৎ। স্বামীর খেদমতে কুন্ঠাবোধ করা উচিৎ নয়। স্বামী কোন অনর্থক কষ্ট কর কাজের (গুনার কাজ ব্যতিত) আদেশ করলেও স্ত্রীকে তা পালনে তৎপর থাকা উচিত।

❑ হাদীস শরীফে আছে:- একদিন এক নারী মহানবী (সঃ) এর কাছে এসে আরজ করলেন, হুজুর! পুরুষ মানুষ জিহাদের ময়দানে গিয়ে অশেষ সওয়াব লাভ করে। এর পরিবর্তে আমরা কি করব? জবাবে মহানবী (সঃ) বললেন- তুমি স্বামীর হক আদায় কর এবং তার আদেশ মেনে চল।

❑ হাদীস শরীফে আছে:- একদিন হযরত আয়শা (রাঃ) আরজ করেন হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) নারীর প্রতি বেশি হকদার কে? মহানবী (সঃ) জবাবে বললেন স্বামী।

❑ হাদীস শরীফে আছে:- স্বামী যদি স্ত্রীকে এক পাহাড়ের পাথর অন্য পাহাড়ে সরাতে আদেশ করেন, তবে স্ত্রীর জন্য সেটাই করা উচিৎ। (আহমদ)

❑ রাসূল (সঃ) আরও বলেছেন:- স্ত্রী যদি চুলার উপরও থাকে আর এ অবস্থায় স্বামী তাকে ডাকে, তবে তার ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত (যদিও চুলায় পুড়ে কোন কিছু নষ্ট হোক না কেন)।

❑ হাদীসে আরও আছে: স্বামী-স্ত্রী যদি কোন যানবাহনের উপরও থাকে, এ অবস্থায়ও (সম্ভব হলে) স্বামীর ইচ্ছা পূর্ন করা স্ত্রীর উপর কর্তব্য। (কাশফ)

স্বামীর সাথে ভাল আচরণ করলে স্বামীর নেক আমলের সওয়াবও স্ত্রীরা পাবে

নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন: নারীরা স্বামীর সাথে ভাল ব্যবহার, স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন ও আনুগত্যের দ্বারা স্বামীর সমস্ত নেক আমলের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে।

আল্লাহ্ তায়ালা কোন ধরণের স্ত্রীদের পছন্দ করেন

নবী করিম (সঃ) বলেছেন:- "আল্লাহ্ তায়ালা ঐ মহিলাদের ভালবাসেন যে স্বামীর সাথে মধুর জীবন- যাপন করে এবং নিজেকে পুত ও পবিত্র রাখে।"

স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল ইবাদত করা উচিত নয়

স্ত্রীগন স্বামীর উপস্থিতিতে নফল এবাদত করবে না রাসূল (সঃ) বলেছেন: "স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন নফল রোযা রাখবে না"। (আবু দাউদ)

কোন্ কোন্ সময় স্বামীর ডাকে সাড়া না দিলে ফেরেস্তাগণ অভিশাপ দিতে থাকেন

হাদীস শরীফে আছে:- "স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় যেতে ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য করে, এ অবস্থায় যদি স্বামী রাগ করে রাত্রি যাপন করে, সেই স্ত্রীর উপর ফেরেশ্তাগন সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকেন।" (বুখারী)

স্বামীর অসন্তুষ্ট অবস্থায় স্ত্রী মারা গেলে সে বেহেস্তে যাবে না

বিশ্বনবী বলেছেন: "যে স্ত্রী মারা গেল এমতাবস্থায় যে তার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট, সে বেহেশতে যাবে না।"

স্বামীকে কষ্ট দিলে বেহেশ্তের হুরেরা ধিক্কার দিতে থাকেন

রাসূল (সঃ) ফরমায়েছেন: " যখনই কোন স্ত্রী লোক তার স্বামীকে দুনিয়ায় কষ্ট দিতে থাকে, তখনই বেহেশতের আনত নয়না হুরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে, সে বলতে থাকে- (হে অভাগিনী:) তুমি তাকে কষ্ট দিওনা। আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন, তিনি তোমার কাছে মেহমান, অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন"। (তিরমিযি শরীফ)

স্বামীর না শোকরীতে জাহান্নাম

নবী করিম (সঃ) বলেন:- দোজখের অধিকাংশ অধিবাসী মেয়েলোক হবে। তার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন তারা বেশী বেশী অভিশাপ দেয় এবং স্বামীর না শোকরী করে।

যেভাবেই হোক স্বামীর খেদমত করা উচিত

হাদীস শরীফে আছে– এক মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট এসে বললেন- "স্ত্রীর উপর স্বামীর কি হক?" উত্তরে নবীজী (সঃ) বলেছেন- "যদি স্বামীর সারা শরীরে পুঁজ ভর্তি ঘা থাকে এবং ঐ পুঁজ স্ত্রী জিহ্বায় চেটে পরিস্কার করে তবুও স্বামীর হক আদায় হবে না।" (ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন)

❑ নবী করিম (সঃ) আরও বলেছেন- "হে নারী জাতি! যদি তোমরা জানতে তোমাদের উপর স্বামীদের কি হক রয়েছে তাহলে তোমরা তাদের পদধূলি আপন চেহারা , গাল বা জিহ্বা দ্বারা পরিস্কার করতে।"

স্বামীর অসন্তুষ্টিতে আল্লাহও অসন্তুষ্ট

❑ যে স্ত্রীর উপর সঙ্গত কারণে স্বামী অসন্তুষ্ট, তার উপর আল্লাহ্ তায়ালা অসন্তুষ্ট।"(কাশফ)

❑ রাসূল (সঃ) বলেছেন: "আল্লাহ্ তায়ালা এরূপ স্ত্রীর প্রতি রহমাতের নজর করেন না, যে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং তার প্রতি খুশী হয় না"। (কাশফ)

❑ নবীজি (সঃ) একজন মেয়ে লোককে হিদায়াত করতে গিয়ে বলেছিলেন- "তোমার স্বামীই তোমার বেহেশ্ত ও দোযখ" (কাশফ)

❑ হাদীস শরীফে আরও আছে: "যে স্বামীর হক আদায় করে না সে আল্লাহর হক আদায়কারী হিসাবে গন্য হবে না"। (কাশফ)

❑ নবী করিম (সঃ) বলেছেন- "আমি এই প্রকার স্ত্রী লোকদের প্রতি অসন্তুষ্ট, যারা কাপড়ের আঁচল ঝুলিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে কথা বলে বাহিরে চলে আসে"। (কাশফ)

স্বামীর অনুমতি ব্যতিত স্ত্রীদের কোথাও যাওয়া উচিত নয়

স্বামীর ইজাযত ছাড়া কখনও ঘর থেকে বের হবে না। কোথাও যেতে চাইলে, যদি স্বামী নিষেধ করেন, তাহলে সেখানে যাওয়া স্ত্রীর জন্য উচিত নয়। নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেছেন- "স্ত্রী যদি স্বামীর বাড়ী হতে বাহির হয়, অথচ স্বামী বাহির হওয়াকে অপছন্দ করে, তবে আসমানের ফেরেশ্তাগন এবং মেয়ে লোকটি যেদিক দিয়ে যাবে সে দিকের সকল বস্তু তার উপর লা'নত করে, যতক্ষন পর্যন্ত সে ফিরে না আসে।" (কাশফ)

স্বামীর খারাপ আচার-আচরণ ও ব্যবহারে ধৈর্য্য ধারণ করলে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ার সমান ছওয়াব হয়

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং অভিমান বরদাশ্ত করা ফজীলতের বিষয়। হাদীস শরীফে আছে:- "যে স্ত্রী তার স্বামীর খারাপ আচার-ব্যবহারে সবর করবে, সে ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়ার সমান ছাওয়াব পাবে।" (ইহ্য়াউল উলুমুদ্দীন)

নেক্কার স্ত্রীরাই স্বামীদের আনুগত্য করে

মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- "পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্যই যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের একের উপর অন্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, স্বামীরা (হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম ও খাটুনি দ্বারা উপার্জনের) স্বীয় অর্থ-সম্পদ দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করে, সেমতে নেক্কার স্ত্রীগণ হয় স্বামীর আনুগত্য এবং আল্লাহ্ যা হিফাযত যোগ্য করে দিয়েছেন, লোক চক্ষুর অন্তরালে ও তার হিফাজত করে।" (সূরা নিসা-৩৪)

স্ত্রীদের ঘরের টুকি-টাকি কাজগুলোও ছাওয়াবের অর্ন্তভূক্ত

স্বামীর সন্তুষ্টি ও মনোরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য করা স্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্বামীর খেদমত ও আনুগত্য করাকে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মাধ্যম মনে করবে। স্ত্রী নিজের ঘরের কাজ-কর্ম যথা সম্ভব নিজ হাতে করাকে ছাওয়াব ও বরকতের বিষয় মনে করবে এবং ঘরোয়া কাজে কোন প্রকার লজ্জাবোধ করবেনা।

❑ হাদীস শরীফে আছেঃ- স্বামীর ঘরের কাজ কর্ম করাও তার হক পালন জিহাদের সমতূল্য।

❑ হাদীস শরীফে আরও আছেঃ- মহিলারা যখন গর্ভবতী হন তখন ঘরের টুকি-টাকি যে কাজ করে তাতেও দিনভর রোজা এবং রাতভর এবাদত করলে যে ছওয়াব হয় তা স্ত্রীর আমল নামায় লেখা হয়।

স্ত্রীদের সুন্দরী ও রূপসী হবার মূলমন্ত্র কি?

স্ত্রীর সুন্দরী ও রূপসী হওয়ার মূলমন্ত্র হল স্বামীর আনুগত্য ও অনুসূরণ। স্বামীর আনুগত্য ও ফরমাবরদারী স্ত্রীর সহজাত ও জন্মগত স্বভাবে পরিণত হওয়া উচিত। তাহলে তা তাকে সৌন্দর্য মন্ডিত করবে। স্বামীর চোখে সে অপরূপী দেখাবে যদিও তার বাহ্যিক রং ফর্সা না হোক।

স্ত্রীর মনে রাখতে হবে- তার জন্যই স্বামী রাতকে দিন করে এবং দিনকে করে রাত। তার সুখ-শান্তি ও ভোগ বিলাসের জন্য সর্বদা করে মেহনত, তার আনন্দ উল্লাসের জন্য পরিশ্রম করতে করতে নিজেকে করে ক্লান্ত। স্ত্রীর দুঃখে হয় দুঃখী আর স্ত্রীর সুখে হয় শান্ত, যে স্বামী তার স্ত্রীর জন্য এমন আত্ম বিসর্জন দিতে পারে। সে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কত বড় হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এই স্বামীর খেদমত ও আনুগত্য পারিবারিক সুখ ও শান্তি ও সৌহার্দ্যের জন্য একান্ত আবশ্যক। স্বামীর আনুগত্য করা এবং তার বাধ্য হওয়া স্ত্রীকে প্রিয়তমা থেকে অতি প্রিয়তমা বানিয়ে দেয়, সুন্দরী থেকে অতি সুন্দরী বানিয়ে দেয়, স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষন সৃষ্টি হয়।

স্ত্রীর জন্য স্বামীর আনুগত্য ও ফরমাবরদারী যেমন উভয়ের জীবনকে সুখময় ও আনন্দময় করে তোলে, তেমনিভাবে স্বামীর নাফরমানী ও অবাধ্যতা উভয়ের জীবনকে অশান্তিময় করে তোলে।

আমাদের সমাজে কিছু নির্বোধ মহিলা এমনও রয়েছে, যাদের স্বামী যদি স্ত্রীর কোন আচরণে কিংবা কথা না মানার কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে

অভিমান করে কথা বন্ধ করে দেয় বা সামান্য রাগারাগি করে, তাহলে উক্ত মহিলাও নিজ স্বামীর অসন্তুষ্টি দূর করার পরিবর্তে নিজেও রাগ হয়ে গাল ফুলে বসে থাকে। হাদীসে এমন নারীদের ব্যাপারে হুশিয়ারী এসেছে। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমতী, জ্ঞানবতী তারাই যারা প্রেম দিয়ে ও ভালবাসা দিয়ে সবসময় স্বামীর মন জয় করে রাখে। স্বামীর সামান্যতম ও অসন্তুষ্টি তাদের বরদাশ্‌ত হয় না। ছলে-বলে, কলে-কৌশলে অসন্তুষ্ট স্বামীকে তারা সন্তুষ্ট হতে বাধ্য করে।

কোন স্ত্রীর নামাজ কবুল হয় না

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন- রাসূল (সঃ) বলেছেন- "তিন ব্যক্তির নামাজ কবুল হয় না এবং তাদের নেকী আকাশের দিকে উঠে না। তার মধ্যে থেকে একজন হল- সেই নারী যার উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট যে যাবত না সে তাকে সন্তুষ্ট করে।" (বায়হাকী ৫:১১)

কোন স্ত্রী জান্নাতী

নবী করীম (সঃ) বলেছেন- "আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীগনের কথা বলব না? শুনে রাখ নবীগন জান্নাতী, সিদ্দীকগন জান্নাতী, শহীদগন জান্নাতী এমনভাবে শহরের একপ্রান্তে বসবাসকারী কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতকারী জান্নাতী, আর ঐ নেকবতী মহিলাও জান্নাতী, যে অধিক পরিমানে সন্তান জন্ম দেয় এবং স্বামীর রাগন্বিত অবস্থায় বা নিজের রাগন্বিত অবস্থায় স্বামীর হাত কোমলভাবে আঁকড়ে ধরে বলে হে প্রান প্রিয়! যতক্ষন আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হবেন, ততক্ষণ আমি কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করব না। এভাবে সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে নেয়।" (নাসায়ী শরীফ)

"যে নারী এমত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (তিরমিযী)

সহবাসের সময় কি নিয়ত করা উচিত

সহবাসের জন্য স্বামী-স্ত্রীর উত্তম নিয়ত করা সওয়াবের কাজ। হযরত আলী (রাঃ) বলেন- সহবাসের আগ্রহী হলেই স্বামী-স্ত্রী এ নিয়ত করবে যে, এই সহবাস দ্বারা আমরা ❑ যিনা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকব ❑ সব রকম অন্যায় আনন্দ থেকে দূরে থাকব ❑ সৎ সন্তান জন্ম দিয়ে উম্মতে মোহাম্মদী বৃদ্ধি করব এবং দ্বীনের জন্য ওয়াক্‌ফ করব। এভাবে নিয়ত করা দ্বারা স্বামী-স্ত্রী নিশ্চিত সওয়াবের অধিকারী হতে পারে।

যে ব্যক্তি সন্তান লাভের আশায় স্ত্রী সহবাস করে। আর যদি উক্ত সহবাসে সন্তান নাও হয় তবুও তার আমল নামায় একজন শহীদ সন্তানের ছওয়াব লেখা হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা কোন্ মহিলার দিকে রহমতের দৃষ্টি দান করেন না

রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন- "আল্লাহ্ তায়ালা এমন স্ত্রী লোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন না যে তার স্বামীর ভাল ভাল কাজের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না।"

স্ত্রীদের জিদ সম্পূর্নরূপে পরিহার করা উচিত

স্ত্রী লোকদের একটি অন্যতম প্রধান দোষ হচ্ছে জিদ ও হঠকারীতা। কিছু কিছু স্ত্রীদেরকে দেখা যায় তারা কোন সামান্য ব্যাপারেও তাদের মর্জি ও মন মেজাজের বিপরীত ঘটলেই তারা আগুনের মত জ্বলে উঠে। ইহা উচিত নয়। বরং জিদ পরিহার করে স্বীয় ইচ্ছার ব্যাপারে অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে স্বামীকে বুঝান, বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে স্বামীর মনের সকল দ্বিধা-দ্বন্দের কালিমা দূর করে দেওয়া উচিত। তার বদলে রাগ করে, মুখ ভার করে তর্ক বিতর্ক করে গোটা পরিবেশকে তথা পারস্পরিক সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলা কখনোই কাম্য নয়।

অনেক সময় দেখা যায় হয়তো স্ত্রী সত্যিই কোন অন্যায় করে নাই, অথচ স্বামী ভূল বুঝেই বকাঝকা শুরু করল। এমতাবস্থায়ও বলা উচিত যে, আমার ভূল হয়েছে, আমাকে মাফ করে দিন। স্বামীর কাছে মাফ চাইলে, স্ত্রী কখনও ছোট হয় না। বরং স্বামীর যখন রাগ পড়ে যাবে, তখন সে নিজেই লজ্জিত হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে স্বতস্ফূর্ত ভাবে অধিক ভালবাসবে। আর যদি ভুল স্বীকার ও মাফ চাওয়ার এতটুকো উদারতা দেখানো সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত কোন প্রতি উত্তর না করে সম্পূর্ন ভাবে চুপ করে থাকাই অধিক সংগত।

স্ত্রীদের স্বামীর সামনে সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত থাকা উচিত

স্ত্রী লোকের সদা-সর্বদা স্বামীর মনের আনন্দের জন্য সুন্দর সাজে পরিপাটি থাকা একান্ত কর্তব্য। স্বামীর চোখে তার নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা উচিত। অনেক স্ত্রীদের দেখা যায় তারা স্বামীর সামনে ময়লা-নোংড়া হয়ে থাকে, অপরিপাটি ও অগোছালো থাকে। অনেক সময় দেখা যায় স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে বলে তুমি একটু সাজো

বা তুমি প্রতিদিন রাতে সাজবে ইত্যাদি। কিন্তু তারপরও বেশীর ভাগ স্ত্রী সাজে না। বলে যে, তাদের সাজতে লজ্জা লাগে। লজ্জা শরমের দোহাই দিয়ে তারা স্বামীর চাওয়া ও ইচ্ছাকে প্রত্যাখান করে।

অত্যন্ত আফছুছ ও পরিতাপের বিষয় এমনও অনেক স্ত্রী লোক আছে যারা স্বামীর সাথে তর্ক করতে, ঝগড়া করতে লজ্জা পায়না, অথচ স্বামী যখন সাজ-গোজ করতে বলে, তখন লজ্জা এসে তাদের ঘিরে ধরে। স্ত্রী লোকের এ ধরনের কাজ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

পূর্নাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমলের মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব

স্বামী-স্ত্রী দ্বীনদার হলে দ্বীনি বুঝের কারণে বহু সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে তারা শান্তির পরিবেশ গঠনে সক্ষম হন। স্বামী যদি দ্বীনদার না হয় আর স্ত্রী যদি দ্বীনদার হয়, তাহলে স্ত্রীর কর্তব্য হল আদরের সাথে স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দ্বীনের পথে পরিচালিত করা। আর স্ত্রী যদি দ্বীনদার না হয়, স্বামী যদি দ্বীনদার হয় তাহলে স্বামীর কর্তব্য হবে আদরের সাথে স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দ্বীনের পথে পরিচালিত করা। সব সময় একটা কথা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, আমরা যে কোন মূল্যেই হোক না কেন পরিপূর্ন দ্বীন এবাদতে জেসমানী, এবাদতে রূহানী ও এবাদতে মালী, নায়েবে রাসূলের মাধ্যমে শিক্ষা ও আমল করে আমাদের দাম্পত্য জীবনকে সুখময়, প্রেমময় ও শান্তিদায়ক করে তুলব ইনশাআল্লাহ।

যদিও একার পক্ষে তা সম্ভব নয় তথাপি নারীরা যদি এ ব্যাপারে স্বীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়, তাহলে পুরুষদের থেকে অনুরূপ সহযোগিতা আশা করা যায়। আর যদি পুরুষরাও এ ব্যাপারে স্বীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়, তাহলে নারীদের থেকেও অনুরূপ সহযোগিতা আশা করা যায়। এভাবেই গড়ে তোলা যেতে পারে একটি সুন্দর ও স্বার্থক আদর্শ পরিবার।

স্ত্রীদের ব্যবহারে আল্লাহর আরশ কখনও হাসে আবার কখনও কাঁদে

কোন স্ত্রীর দূর্ব্যবহারের ফলে স্বামীর চোখে যখন পানি আসে তখন আল্লাহর আরশ কাঁদতে থাকে আবার স্বামীর মুখে যদি কোন স্ত্রী শরবত বা অন্য কোন বস্তু তুলে দেয় এবং মুচকি হাসে, তখন আল্লাহ্ তায়ালার আরশ ও হাসতে থাকে এবং আরশবাহী ফেরেশতাগন ঐ মহিলার মাগফিরাত কামনা করেন।

স্বামীর এনে দেয়া যে কোন জিনিস স্ত্রীর আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করা উচিত

স্ত্রীকে স্বামীর সহিত সুখ-দু:খ, বিপদ-আপদ ভাগাভাগি করে নিতে হবে এবং প্রতিকূল অবস্থায় আরোহন করতে হবে ছবরের বাহনে। প্রতিটি মা বোনের উচিত যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হলেও স্বামীর আদেশ পালন করা এবং স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা। স্বামী জান প্রান দিয়ে চেষ্টা করে স্ত্রীকে খুশি করার জন্য এটা স্ত্রীর বুঝা উচিত। কোন ব্যবহার্য জিনিস যদি স্বামী-স্ত্রীকে এনে দেয়, তা পছন্দ না হলেও স্ত্রী এমন ভাব দেখাবে যে, পছন্দ হয়েছে। তাহলে আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাতের মধ্যে উত্তম পোষাক দান করবেন বলে হাদীসে রয়েছে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী অন্য বিছানায় রাত কাটালে তার জন্য শক্ত আযাবের হুশিয়ারী এসেছে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কি করা উচিত

❐ আল্লাহ্ ও রাসূল (সঃ) এর নির্দেশনা এবং দ্বীনের হুকুম মেনে চলবে ❐ দ্বীনদারী ছাড়া দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত শান্তি সুখ আশা করা যায় না। ❐ সর্বদা হাসি-খুশী ও উৎফুল্ল ভাবে একে অপরের সামনে থাকবে, ❐ সর্বদা সেজে গুজে হাসি-খুশী ভাবে একে অপরের সামনে উপস্থাপন করবে। ❐ শ্বশুর-শাশুরীর কাছে ভাল ও আন্তরিক থাকার চেষ্টা করবে। ❐ একে অপরের পছন্দ ও মতামতকে অগ্রাধিকার দিবে। ❐ মিষ্টি ভাষায় কথা বার্তা বলবে ❐ একে অপরকে প্রান ঢেলে মন খোলাভাবে ভালবাসবে ❐ স্বামী যা কিছু ভালবাসেন, পছন্দ করেন সর্বাবস্থায় তা মনে রেখে তাই করবে ❐ শরীয়ত সম্মত স্ত্রীর অপছন্দনীয় কোন কাজ করা উচিত নয়। ❐ স্ত্রীর কোন জিনিস প্রয়োজন হলে চাওয়ার আগেই তা এনে দিবে। ❐ উভয়েই পর্দার বিধান মেনে চলবে। ❐ সকল পুরুষের মন সমান নয়, তাই কোন স্বামী যদি একটু রাগী হন কিংবা সামান্যতেই রাগ করেন, তাহলে স্ত্রীদের উচিত স্বামী যেভাবে চলতে বা চালাতে চান, নিজের কিছুটা ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হলেও তা মেনে নেওয়া। ❐ নারীদের বক্রতা স্বভাব জাত, এটা তাদের দোষ নয় বরং সৃষ্টি বৈচিত্র। তাদের এই বক্রতা মেনে নিয়েই উপকৃত হতে হবে। তাই স্বামীর জন্য স্ত্রীর সবগুলো ত্রুটি ও ভুলকে ভালোবাসার মন দিয়ে ক্ষমা করতে হবে এবং তাকে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর স্বামীর রাগ ও অভিমানের জবাব স্ত্রীকে ভালোবাসা দিয়ে দিতে হবে। ❐ সব সময় স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনেরই হয়ে থাকবে। স্ত্রীগন সব সময় স্বামীর সেবা-যত্ন, হুকুম-নিষেধ মন প্রান দিয়ে পালন করবে। স্বামীরাও স্ত্রীদের মূল্যায়ন করবে।

বৈবাহিক জীবনে মনোমালিন্য ও অভিমান হলে তা কিভাবে নিস্পত্তি করবেন

দাম্পত্য জীবন ঝাল, মিষ্টি, টকে ভরা এক পাঁচ মিশালী স্বাদের চকলেট। ফলে সংসার চালাতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মান অভিমান, মন কষাকষি, এমনকি ঝগড়া-ফাসাদ হওয়াটা বিচিত্র নয়। এ অবস্থায় পরস্পরকে ক্ষমা করে দেয়া, ধৈর্য্য ধারণ করা, পরস্পরের প্রতি সহনুভূতিশীল হওয়া আবশ্যক। ইসলামের বিধান হল স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখবে, তেমনি স্ত্রীও স্বামীর ভুল দোষগুলো ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবে। তাহলেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে গড়ে উঠতে পারে প্রেম-প্রীতি ভালবাসার তাজমহল।

❐ স্ত্রী হিসেবে সব দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করবে ❐ ধৈর্য্য সহকারে নিজেকে সংযত রেখে সাথীর সংস্পর্শে যাবেন ❐ স্বামীর মন মানুষিকতা বুঝে মজা করে কিছু বলবেন ও হাসাবার চেষ্টা করবেন। ❐ স্বামীকে খুশী করার জন্য কখনো এমনিতেই নিজের ভুল স্বীকার করবেন। ❐ কখনো স্বামীর দু'হাত ধরে বলবেন আমার ভূল হলে একবার কেন সাতবার আমাকে মারেন তবুও আমার প্রতি খুশী হয়ে একটু হাঁসেন। ❐ প্রয়োজনে চোখের পানি ফেলে স্বামীকে বুঝানোর চেষ্টা করবেন, আমি খুবই কষ্টে আছি। প্রান প্রিয় স্বামীর সোহাগ ও আদর না পেয়ে সত্যিই আমি অসহায় ❐ স্বামী যেখানে বসেন বা অবস্থান করেন, তার পাশে নিরব ও নিস্তব্ধ অবস্থায় বসবেন। প্রয়োজনে একপায় দাঁড়িয়ে থাকবেন ❐ স্বামী কোন কাজে অসন্তুষ্ট হন? কোন কথায় তিনি বেশী রাগন্বিত হন? কোন কথায় তিনি আজ রাগ কম করেছেন হঠাৎ কি কারণে কোন আচরণে তিনি আমার সাথে হাঁসলেন? তিনি আজকে কেন আমাকে ধমক দেন নি? অনুরূপভাবে স্ত্রীদের বেলায়ও লক্ষ্য করতে হবে। এই সকল বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বৈবাহিক জীবনে পথ চললে জ্ঞানবান স্বামী-স্ত্রী নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারবেন।

❐ এভাবে করলে দেখবেন এক সময় আপনার প্রিয় সাথী আপনার কোমল হাত দু'খানা ধরে কাছে টেনে নিবেন। কোন ভুল থাকলে সংশোধন করার পরামর্শ দিবেন।

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি গভীর ভালবাসা থাকা উচিত

স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে যদি আপন করে নিতে পারে আর স্ত্রীও যদি তার স্বামীকে মনে প্রানে ও আচরণে গ্রহণ করতে পারে তাহলে তাদের মাঝে নিবীড় প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর সংসার সুখের হয়ে উঠে জান্নাতী ধারায়। এ ভালবাসা যেখানে থাকে সেখানে অধিকার ও

কর্তৃত্বের প্রশ্নই উঠেনা। আর যখনই এই ভালবাসা কমে যায় কিংবা কোন মুহূর্তে ভালবাসার অভাব ঘটে, তখন অধিকারের মানদন্ডে সমস্যার সমাধান করতে হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- "স্বামীদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে তেমনি স্ত্রীদের রয়েছে স্বামীদের উপর যথাযথভাবে। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী বৈবাহিক জীবন যাপন করতে পারলে অবশ্যই দুনিয়াতে সুখ পাওয়া যাবে। আর পরকালেও স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য জান্নাত লাভের সহায়ক হবে।

স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভাল আচরণ করবে

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন- "তোমরা স্ত্রীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর" তবে এও হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে বহু কল্যাণ রেখেছে তোমরা তাই অপছন্দ করছ। (সূরা নিসা-১৯)

নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেন-"তোমরা স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার কর" (নাসায়ী শরীফ)

রাসুলূল্লাহ (সঃ) আরো ফরমায়েছেন- "সেই শ্রেষ্ঠ ও পূর্ন ঈমানদার যার ব্যবহার ও চরিত্র উত্তম এবং বিশেষ করে বাড়ীর মানুষের (স্ত্রীর) সাথে মিষ্ট ভাষী"। (তিরমিযী)

রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-তোমাদের মধ্যে ঐ স্বামী উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।

স্ত্রীকে যাহা কিছু দেওয়া হয় তাতে ছওয়াব হয়

পরিবার ও সন্তান-সন্তুতি বিশিষ্ট লোক যদি পরিবারের লোকদিগকে সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে আহার এবং পরিধেয় বস্ত্র দান করে এবং রাত্রে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সন্তানদিগকে নগ্ন দেহে দেখিলে তাহাদের গায়ে কাপড় পরাইয়া দেয় তবে তাহার এই কার্যগুলি জেহাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গন্য হয়। হযরত রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ-যদি কোন ব্যক্তি একটি স্বর্ণ-মুদ্রা কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করে, আর একটি স্বর্ন মুদ্রার বিনিময় দাস ক্রয় করিয়া মুক্তি প্রদান করে, আর একটি স্বর্ন মুদ্রা নিয়ে পত্নীর ভরন পোষনের জন্য দান করে, তবে এই শেষোক্ত মুদ্রাটির সওয়াব সর্বাপেক্ষা অধিক হবে।

নবী করিম (সঃ) বলেন- স্ত্রীর খেদমত করা সদকার সমতুল্য (কানযুল উম্মাল)

মহানবী (সঃ) আরো ও ইরশাদ করেন- "তোমাদের স্বীয় স্ত্রীর সহিত সহবাস দ্বারাও সদকার ছাওয়াব হবে"। (মুসলিম শরীফ)

স্ত্রীকে কোন কিছু খেতে দেওয়ার মাঝেও ছওয়াব রয়েছে এতে আল্লাহ্ পাক নেকী দান করেন।

এমনকি স্ত্রীর মন তুষ্টি ও সন্তুষ্টি করার জন্য নিস্প্রয়োজনেও কোন কিছু দেওয়াতে নেকী লাভ হয়।

স্ত্রীর মন্দ আচার ব্যবহারে ধৈর্য্য ধরলে আইয়ুব (আঃ) এর ধৈর্য্যের সমান ছাওয়াব হয়

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং অভিমান বরদাশ্ত করা ফজীলতের বিষয়।

রাসূল (সঃ) বলেছেন- " যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর মন্দ আচার ব্যবহারে সবর করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এতটুকু ছাওয়াব দিবেন যতটুকু নবী আইয়ুব (আঃ)কে তাঁর মুসীবতের উপর সবরের কারণে দিয়ে ছিলেন।"

স্বভাবগত ভাবেই মেয়েরা বাকা হাড়ের তৈরী সুতরাং কৌশলে তাদের সংশোধন করা প্রয়োজন

স্ত্রীর জ্ঞান বুদ্ধির অসম্পূর্নতা, শারিরীক দূর্বলতা ও সৃষ্টিগত স্বভাবের বক্রতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সর্বদা খেয়াল রেখে তাদের সংগে দয়া-মায়া সহানুভূতির ব্যবহার করা। তাদের অভিমান রক্ষা করা এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কষ্ট সহ্য করতে থাকা স্বামীর কর্তব্য। নারীদের বক্রতা স্বভাবজাত এটা তাদের দোষ নয় বরং সৃষ্টি বৈচিত্র। তাই রাসূল (সঃ) বলেছেন- স্ত্রীদের সহিত ভালো ব্যবহার করার জন্য। তিনি বলেন আমি তোমাদেরকে ওছিয়ত করিতেছি- তাদেরকে বাম পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। হাড়ের মধ্যে বাম পাঁজরের হাড়ে বক্রতা বেশী থাকে, তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তবে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি সোজা না কর তবে তা বক্রই থাকবে। তাই বক্রতা মেনে নিয়েই নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। (বুখারী/মুসলিম)

এমন আশা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব যে, স্ত্রী পরিপূর্ণ সংশোধিত হয়ে নিজের মন মত হয়ে যাবে। আল্লাহ্পাক নারী জাতির মাঝে প্রকৃতিগতভাবে বক্রতা সৃষ্টি করে রেখেছেন, তা কখনো পরিবর্তিত হতে পারে না। তাই স্ত্রীর সাধারণ ও তুচ্ছ ভুল ভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে তার উপর কঠোরতা প্রয়োগ চরম নির্বুদ্ধিতা। সে তো তোমার জন্য মাতা-পিতা-আত্মীয় স্বজন সবাইকে ত্যাগ করে এসেছে, এখন তো তার দৃষ্টি একমাত্র তোমার দিকে নিবদ্ধ, তুমিই তার একমাত্র আশা ভরসার পাত্র। এখন স্বামীর কাছে যদি তার ঠাঁই না হয়, তবে কার কাছে তার আশ্রয় হবে?

সুতরাং মানবতার দাবি এটাই যে, একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া এবং তার সমস্ত ভুল-ভ্রান্তিকে ক্ষমা-উদারতা ও সহনশীলতার দৃষ্টিতে দেখা। কেননা তার বুদ্ধি বিবেচনা অপরিপক্ক, ভালমন্দ বিচার ক্ষমতা দুর্বল, কথা বলার যথোপযুক্ত তরীকা তার জানা নেই, ফলে কথাবার্তায় হিতে বিপরীত হয়ে যায়। স্বামী মনে করে সে তার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করছে, অথচ বাস্তবে এটা তার স্বামীর সাথে মান-অভিমান ছাড়া আর কিছুই না। স্বামী ছাড়া সে আর কার সাথে অভিমান করতে যাবে? স্বামীই তো এ দুনিয়ায় একমাত্র তার আশা ভরসার স্থল।

একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা না করলে কেয়ামতের দিন একপাশ অবশ অবস্থায় উঠবে

স্বামীর পক্ষে একজন স্ত্রী নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ন সতন্ত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। সকল স্ত্রীর হক আদায় ও সকলের সাথে সম ব্যবহারের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য তা জায়েজ করা হয়েছে। নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন- যার একাধিক স্ত্রী আছে, সে যদি সকল স্ত্রীর প্রতি সমতা বিধান না করে, তাহলে কেয়ামতের দিন সে একপাশ অবশ অবস্থায় উঠবে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে পার্থিব ও দ্বীনি কাজে সহযোগিতা করা প্রয়োজন

মহান আল্লাহ্ তায়ালা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক প্রেম প্রীতি, দয়ামায়া ও সহায়তা সহানুভূতির নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কের ধারা তাদের বজায় রাখতে হবে। স্বামী-স্ত্রী পার্থিব ব্যাপারে যেমন সহযোগিতা বিরাজমান রাখবে, তেমনি তাদের দ্বীনি সহযোগিতার প্রতি লক্ষ্য দিতে হবে। দ্বীন পালনে তাদের কারো মধ্যে কখনো শৈথিল্য পরিলক্ষিত হলে অপরজন তাকে সজাগ করে তুলবে, যাবতীয় অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখতে একে অপরকে হিকমতের সহিত বুঝাবে। হাদীস শরীফে স্বামী-স্ত্রীর এ দ্বীনি সহযোগিতার প্রশংসা ও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। বহু স্বামী শয়তানের ধোকায় বিপদগামী হলেও স্ত্রীদের হেকমত পূর্ন প্রচেষ্টায় সুপথে ফিরে এসেছে। তেমনিভাবে অনেক বেপরোয়া উশৃংখল স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সুন্দর আচরণের কারণে সুপথে চলে এসেছে।

স্বামী-স্ত্রীর মনে করতে হবে যে, তাদের এ পবিত্র বন্ধন যেন শুধু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীতেই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং মৃত্যুর পর ও পরকালে জান্নাতে তারা যেন স্বামী স্ত্রীরূপে অনন্ত জীবনের সুখ শান্তির সাথী হয়ে ধন্য হতে পারে। প্রতিটি স্বামী স্ত্রীর এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

পারিবারিক সুখ শান্তি ও সামাজিক উন্নতি অগ্রগতি সাধনের জন্য স্বামী ও স্ত্রী পারস্পরিক আদর মমতা, সহানুভূতি, সহানশীলতার ভূমিকা অপরিহার্য। যদি উভয়ের মধ্যে অনাবিল মহব্বতের পরিবেশ সৃষ্টি না হয় বা একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালনে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে, তাহলে সে পরিবার হবে বিষাদ সংকুল, ঠুনকো প্রাসাদের মত ভয়ংকর। তাতে কোন দিন শান্তির পরোশ মিলবে না।

স্বামী–স্ত্রীর একে অপরের উপর অধিকার রয়েছে

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন– "পুরুষদের প্রতি নারীদের ও তদ্রূপ দাবি ও অধিকার আছে। যেরূপ নারীদের প্রতি পুরুষের দাবি ও অধিকার আছে বিধান মত। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"

স্বামী-স্ত্রীর পরিচালক, তাই বলে শোষণ করা উচিৎ নয়

নারী যেহেতু দুর্বল প্রকৃতির ও স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন তাই পুরুষ স্ত্রীর পরিচালক না হলে তারই ক্ষতি অনিবার্য। তাই তাকে পরিচালক বানানো হয়েছে। মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন-"পুরুষগণ স্ত্রী লোকের পরিচালক।"

স্বামীর সুষ্ঠ পরিচালনা আবশ্যক। এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পরিচালনার মাঝে থাকতে হবে হৃদ্যতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বিবিগণের সাথে অপূর্ব মায়া-মমতা, প্রীতি-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের আচরণ করতেন। সারাজীবনে এমন কোন ব্যবহার করেননি যার কারণে কোন স্ত্রী মনঃক্ষুন্ন হয়।

কিন্তু কোন কোন স্বামী পরিচালনার নামে নির্যাতন করে, শাসনের নামে শোষণ করে, ভুলক্রমে স্ত্রীর হাতে সামান্য একটা কিছু হলেও নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করে যা আজ সমাজে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন–তিনি জালিমদের ভালোবাসেন না, বস্তুতঃ জালিমের প্রতিটি জুলুমের বিচার আল্লাহ্ হাশরের ময়দানে করবেন।

অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার পদ্ধতি

স্ত্রীকে স্বামীর কথা মতো চলতে হবে, এতেই তার দুঁজাহানের সফলতা ও মঙ্গল। স্ত্রীর মধ্যে মানার প্রবণতা না থাকলে, সংসারে অতিদ্রুত ভাঙ্গণ ধরবে, অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে আসবে, পারিবারিক জীবন অসার হয়ে পড়বে।

আল্লাহপাক বলেন-"স্ত্রীদের মধ্যে যদি অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদেরে সৎউপদেশ দাও। তাতেও কাজ না হলে, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং (তাতেও যদি কাজ না হয়, সামান্য) প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য (দোষের) অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী (সূরাহ নিসা ৩৪)।

স্ত্রীর অবাধ্যতার সমাধানের জন্য এ আয়াতে বলা হয়েছে তাকে প্রথমে নম্র ভাষায় বুঝানোর চেষ্টা করবে, তার বিবেক বুদ্ধির উন্মেষ ঘটাবে। বুদ্ধিও দূরদর্শিতা থাকলে সে অবশ্যই অনুতপ্ত হবে। কিন্তু তার অবাধ্যতা যদি হঠকারিতায় পরিণত হয়, তখন বিছানা পৃথক করে নিবে। এখানে শুধু বিছানা পৃথক করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ঘর পৃথক করার নয়। কারণ তাতে ক্ষতি আরও বেশী হতে পারে। যদি তাতেও অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম থেকে বিরত না হয়, তবে একান্ত বেয়াড়া ও মুখরা স্ত্রীদেরকে শাসনের উদ্দেশ্যে মৃদ প্রহার করা বিধেয়। এমনভাবে মারবে যাতে শরীরে মাইরের কোন প্রতিক্রিয়া না হয়। অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ, বেদম প্রহার ও চেহারায় আঘাত করা অবৈধ, পরিত্যাজ্য।

মৃদ প্রহারও শাস্তি দানকেও রাসুল (সঃ) পছন্দ করেননি। বরং তিনি বলেছেন "ভদ্র লোকেরা এমন করেনা।" (মা'আরিফুল কুরআন)।

দাম্পত্য জীবনের চাহিদা পূরণ করা নফল নামায পড়া ও রোযা রাখার চেয়ে বহুগুনে উত্তম

বিয়ে যদি সম্ভ্রম ও শ্রীলতা রক্ষার মানসে এবং সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে বিয়ে গণ্য হবে একটি ইবাদত রূপে, যা সমস্ত নফল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। দাম্পত্য জীবনের চাহিদা পূরণ করা নফল নামায পড়া এবং নফল রোযা রাখার চেয়ে বহুগুণে উত্তম। (দুররে মুখতার)

আল্লাহ্তায়ালা কার সাথে দুশমনী রাখেন

হাদীস শরীফে আছেঃ " আল্লাহতায়ালা এমন ব্যক্তির সাথে দুশমনী রাখেন, যে নিজ পরিবার পরিজনের (স্ত্রীর) প্রতি পাষাণ হৃদয়, কর্কশ ভাষী ও অহংকারী হয়।" (মাকারিমুল আখলাক)।

কার নেক আমল আল্লাহ্তায়ালা কবুল করেন না

রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন-"যে ব্যক্তি বদ মেজাজীর দ্বারা পরিবার বর্গকে দুঃখ কষ্ট দিবে, আল্লাহ্তায়ালা তার তওবা ও নেক আমল কবুল করবেন না।" (জাওয়্যাহিরে ইবনে হাজার)

স্ত্রীকে মারধর করা ও অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করা হাদীসের খেলাফ

স্বামী তার স্ত্রীকে যখন তখন কারণে অকারণে যে কোন ছুতা ধরে মারধর ও অশ্লীল গালিগালাজ করা উচিৎ নয়। কোন কোন স্বামী তো এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করে পশুর মতই পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে ফেলে এবং স্ত্রীর পিতা-মাতা তথা চৌদ্দগোষ্ঠী তুলে গালিগালাজ করে থাকে তারা নরাধম পশু ছাড়া আর কি?

- বিশ্ব নবী (সঃ) বলেছেন- "তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে (তোমাদের স্ত্রীদেরকে) মেরোনা এবং তাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করোনা।" (আবু দাউদ)।
- "তোমরা নারীদের চেহারায় প্রহার করবে না এবং অশ্লীল গালি দিবে না।" (আবু দাউদ)।
- তোমরা মেয়ের পিতাকে গালি দিবে না। আমিও মেয়ের বাবা। (কানযুল উম্মাল)
- "মুসলিম নর নারীকে গালি দেওয়া ফাসিকী কাজ" (বোখারী)।
- "স্ত্রী যদি বেধড়ক মারপিট ও উৎপীড়ন নির্যাতনের অভিযোগ করে এবং তা সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক স্বামীকে কঠোর হুশিয়ারী ও ভয় প্রদর্শন করবেন। প্রয়োজনে শাস্তিবিধানও করবেন।" (ফত্ওয়ায়ে শামী)।
- "সর্বদা স্ত্রীর উপর কঠোরতা করে জিম্মি করে রাখা এবং মর্মভেদী কর্কশ ভাষা ও দুর্ব্যবহার দ্বারা দুঃখ কষ্ট দেয়া বড় জুলুম ও নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।" (তাফসীরে জাসসাস)।

স্ত্রীর ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়

স্বামী ও সন্তান সন্ততির খিদমত করা স্ত্রীর কর্তব্য, তবে স্ত্রীর উপর তার ক্ষমতা ও অভ্যাস বহির্ভূত কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়া-যা সে রীতিমত বিপদ বলে মনে করে এবং কষ্ট হয়, এটা উচিৎ নয়। সে যে কাজে যতটুকু অভ্যস্ত, ঠিক ততটুকুই তার দ্বারা করানো উচিত।

স্বামীর সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন

স্বামীকে বুঝতে হবে যে, নারীরা প্রকৃতিগতভাবে অবলা-সরলা। সেহেতু স্বামীর চোখে স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি ধরা পড়া কোন ব্যাপারই নয়। এতদসত্ত্বেও তার ছোট-খাট দোষ ত্রুটিগুলোকে দেখেও না দেখার ভান করা বুদ্ধিমানের কাজ। আর বড় বড় ত্রুটি- বিচ্যুতিগুলো অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। সামান্য একটু ছোট-খাট ব্যাপারকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে দেয়া আহম্মকী ছাড়া আর কিছুই নয়।

শান্ত-মিষ্ট ও ভদ্র-নম্র তথা সর্বগুনে গুনান্বিতা মহিলা নিয়ে ঘরসংসার করতে তো সবাই পারে। চঞ্চলা, মুখরা ও দুর্বিনিতা মহিলাকে একটু মানিয়ে নিয়ে ধৈর্য্য-সহ্য সহকারে সংসার যাত্রা পরিচালনার মধ্যেই স্বামীর কৃতিত্ব।

স্ত্রীকে মহরানা না দিলে কিয়ামতের দিন যিনাকার হিসেবে উঠবে

নবী করিম (সঃ) বলেন-"যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে বিয়ে করে তার মহরানা পরিশোধের ইচ্ছাও পোষন না করে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিন যিনাকার হিসেবেই উঠবে। (তারগীব)

এমতাবস্থায় একজন আদর্শবান স্বামীর উচিত স্ত্রীর মহরানা পরিশোধ করে দেয়া।

হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন- হে যুবক সম্প্রদায়। তোমাদের শক্তি থাকিলে বিবাহ করিবে, আর যদি শক্তি না থাকে তবে তোমরা রোযা রাখিবে। রোযাতে কিছু আত্মরক্ষার যোগাড় হইবে। শক্তির অর্থ বিবির মহরানার টাকা, খোর-পোষ, হাবেলী ইত্যাদি।

বর্তমানে মুছলমান সমাজ মহরানা ধার্য্য করাটা বুঝে, কিন্তু মহারানার টাকা আদায় করিয়া দেওয়াটা একরকম বুঝেই না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, বিবির সহিত রাত্রিবাস করার পরক্ষণে মহরের টাকা আদায় করিয়া দাও। কারণ, পুরুষ তুমি তোমার টাকা দ্বারা ব্যবসা করিয়া টাকা উপার্জন করিতেছ, বিবিকেও তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া দাও। তুমি যেমন ঐ টাকা দ্বারা ইহজগত এবং পরজগতের উন্নতি সাধন করিতেছ, বিবিকেও তদ্রুপ ইহজগত এবং পরজগতের উন্নতি করিতে দাও। তুমি যেরূপ হজ্ব, যাকাত, ছদকায়ে ফিতর, কুরবানী এবং দ্বীন প্রচার কায়েমের জন্য মালী বন্দেগী ইত্যাদি ধর্মের কাজ করিতেছ, বিবিকেও তদ্রুপ করিতে দাও।

কতক বিবিরা মনে করেন, আমাদের খোর-পোষ যাবতীয় খরচ যখন স্বামী হইতে পাইতেছি তখন আর টাকা দিয়া কি করিব? এই ধারণা দ্বীনি ইল্‌মের অজ্ঞতা। মেয়েদের যদি টাকার দরকার না থাকিত তবে আল্লাহ্ তা'আলা মেয়েদিগকে পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নি, ছেলে-মেয়ে থেকে মিরাছ সম্পত্তির ভাগ দিতেন না।

পুরুষদের যেরূপ বহু টাকার দরকার মেয়েদেরও তদ্রুপ ইহজগতও পরজগত হাছিল করার জন্য বহু টাকার দরকার। পুরুষেরা যদি তাহার বিবিকে বেহেশ্‌ত ভূবনে নিয়া যাইতে চাহে, তবে তাহার কোন তহবিল নষ্ট

করা উচিত নহে বরং প্রত্যেক তহবিলের উন্নতিকল্পে সাহায্য করা উচিৎ এবং নিজের মালী ও জেহমানী এবং রুহানী বন্দেগীর সাথে তাহাকে শরীক রাখা উচিৎ। বিবির মহরানার টাকা বা তাহার অন্য কোন তহবিল হইতে একটি টাকাও আত্মসাত করিলে হিসাবান্তে দোযখ ভোগ করিতে হইবে।

স্ত্রীদের সহিত সুখকর গল্প ও আনন্দ দেয়ারমত কথা বলা উচিত

রাসুল (সঃ) বিবিগণের সহিত হাস্য-কৌতুক ও করতেন। তিনি একদিন আয়শা (রাঃ) এর সাথে দৌড়ের পাল্লা দিলেন এবং ইচ্ছে করেই তাতে তার সাথে হেরে গেলেন। আর একদিন একইভাবে দু'জনে দৌড়ের পাল্লা দিয়ে সেদিন হুজুরে পাক (সঃ) দৌড়ে জিতে গেলেন এবং বললেন, আজ তোমার সেদিনের জয়ের বদলা নিলাম।

একবার আকাশ দিয়ে একটি পাখি উড়ে যাচ্ছিল তখন হযরত (সঃ) বিবি আয়শাকে জিজ্ঞাসা করলেন আকাশ দিয়া কি উড়ে গেল বলতে পারেন। আয়শা বললেন ঘোড়া উড়ে গেল। এই জবাব শুনে রাসুল (সঃ) আয়শাকে বললেন আমি আপনাকে আরবের বুদ্ধিমতি মনে করেছিলাম, তখন আয়শা বললেন কেন আপনিই তো বলেছেন যে, হযরত সোলয়মান (আঃ) এর পংকি রাজ ঘোড়া ছিল যাহা আকাশে উড়তো। ইহা যে সেটা নহে তাহা পারলে আপনি প্রমাণ করুন-----

স্বামীকে স্ত্রীর ব্যাপারে কুকথায় ভ্রুক্ষেপ করা অনুচিত

অধিকাংশ মানুষেরই একজনের ভাল অপর জনের কাছে সহ্য হয় না। তাই কোথাও কোন ভাল নববধূর আগমন ঘটলে কিছু কুচক্রী মহল চায় তাদের এই দাম্পত্য জীবনে ঘুন বসাতে। তাই স্বামী স্ত্রী একে অপরের ব্যাপারে কু কথায় ভ্রুক্ষেপ করা অনুচিত।

দেখা গেছে এক মেয়ে তার নানা বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া শিখে বড় হওয়াতে নানারাই তার বিয়ের ব্যবস্থা করে পাশের গ্রামে এক যুবকের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। মেয়েটি ছিল ইয়াতীম। চলছিল তাদের দাম্পত্য জীবন ভালভাবেই। স্বামীর আত্নীয় স্বজনরা নবদাম্পতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু অসৎ প্রকৃতির কিছু লোক বিভিন্ন কুৎসা রটনা করতে লাগলো যে, মেয়েটি একেতো ইয়াতীম, অন্যদিকে নানার বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে বড় হয়েছে ইত্যাদি। বারবার এরূপ সংলাপ শুনে স্বামী বেচারার মন খারাপ হয়ে গেল। স্ত্রীর বিভিন্ন গুণাবলীর কথা ভুলে গিয়ে তার উপর বিভিন্ন পন্থায় নির্যাতন ও শুরু করে দিল, অসৎ সঙ্গের কারণেই জীবনে অশান্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গেল।

স্বামীকে কিছু বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন

▣ স্বীয় স্ত্রীর অভিমান সহ্য করা ▣ শরীয়াতের সীমার মধ্যে স্ত্রীর মন খুশী করতে চেষ্টা করা ▣ স্ত্রীর সাথে হাসি ও কৌতুক করা ▣ স্ত্রীর আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখা ▣ স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করা ▣ স্ত্রীর মুখে খানা তুলে দেয়া ▣ খোরপোষের সংকীর্ণতা না করা ▣ স্ত্রীর জন্য হাত খরচ প্রদান করা ▣ গায়ের জোরে একটি দেশ জয় করা যায়। কিন্তু মন জয় করা যায় না। তাই স্ত্রীর মন জয় করতে চেষ্টা অব্যাহত রাখা ▣ উভয়ের মধ্যে উপহার বিনিময় করা ▣ স্ত্রীর কাছে রাত্রি যাপন অব্যাহত রাখা ▣ শুধু স্ত্রীর দোষ নয়-গুণগুলোও দেখা।স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করা।

স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া অন্যায়

অন্যায়ভাবে কাউকে নির্যাতন করার ক্ষতি বড় মারাত্মক। জনৈক মহিলা একটি বিড়ালকে খুব কষ্ট দিত। তার মৃত্যুর পর হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জাহান্নামে দেখতে পান। দেখতে পান, জাহান্নামে ঐ বিড়ালটি তার শরীরের মাংস ছিড়ে খুবলে ফেলছে। যখন একটি বিড়ালকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি এই হয়, তবে স্ত্রী ও সন্তানাদিদের নির্যাতন ও কষ্ট দেয়ার শাস্তি কত মারাত্মক হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। তারা হাশরের ময়দানে জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। (দাওয়াতে আবদিয়াত-১১৯/১৯)

শতবার ভাল ভাল ব্যবহারের পর হঠাৎ ২/১টি খারাপ আচরণ ধর্তব্য নয়

রাসুল বলেছেন "কোন মুমিন তার মুমিনা স্ত্রীর কোন একটা অন্যায় আচরণ দেখে বিরক্ত হয়ে বসবেনা। কেননা স্ত্রীর অন্যান্য সদাচরণ আবার তাকে খুশি করবে।

হযরত লোকমান হেকীম একদিন এক লোকের সামনে একটি শশাকে খোশামুক্ত করে এক টুকরা হাতে নিয়ে চিবিয়ে খেতে শুরু করলেন। উপস্থিত লোকটি তাকে খুব মজা করে খেতে দেখে ভাবলো এটা নিশ্চয় খুব মজার জিনিস। তাই সে নিজেও এক টুকরা মুখে দিল। কিন্তু তিতার কারনে সাথে সাথে তা মুখ থেকে ফেলে দিতে বাধ্য হলো এবং ভালভাবে মুখ পরিস্কার করলো। লোকটি বলল লোকমান! তুমি যে এটা বড় মজা করে খাচ্ছিলে ব্যাপার কি? এটাতো প্রচন্ড তিতা! তিনি বললেন,

তিতা তো ঠিকই। তাহলে সে বললো-ওটাকে তুমি তিতা বললে না কেন? তিনি বললেন, "আমি কি বলবো? যে হাতে হাজার বার মিষ্টি দ্রব্য খেয়েছি, সে হাতে জীবনে একবার তিতা জিনিস এলে বলার এমন কি আছে?

হযরত লোকমান (আঃ) এর ঘটনাটি সামনে রাখলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনো ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে না। স্ত্রী মনে করবে স্বামী অসংখ্য বার আমার প্রতি বিনম্র ও কোমল আচরণ করার পর দু'একবার রুক্ষ আচরণ করলে তাতে এমন কিইবা আসে যায়! স্বামী মনে করবে স্ত্রী আমাকে হাজার রকম খেদমত করার পর দু'একটি আচরণ অনাকাংখিত করলে তাতে কি হবে! আমরা কি পারিনা আমাদের স্ত্রীর শত ত্যাগ ও কোরবানীর কথা স্মরণ করে তাহার দোষ ক্রটিকে উদার ও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে?

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি আশ্চর্য ভালাবাসা এবং স্বামীর দোয়ার কি আশ্চর্য ফল

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-হযরত আবু সালামা (রাঃ) মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। কিছুদিন পর গুজব খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, মক্কাবাসী কুরাইশরা সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। একথা শুনে আবু সালামা পুনরায় ফিরে এলেন। মক্কা নগরীতে আসার পর সকলের উপর-ই চললো অত্যাচারের ষ্টীম রোলার। কুরাইশদের অত্যাচারে অধৈর্য্য হয়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ইতোমধ্যে জানতে পারলেন, মদীনায় উদয় হয়েছে ইসলামের সূর্য। মক্কাবাসী নির্যাতিত মুসলমানগণকে মদীনাবাসী আশ্রয় দিচ্ছেন। তাই একদিন রাতে চুপে চুপে স্ত্রী উম্মে সালামা ও শিশু সন্তান সালামাকে নিয়ে একটি উটের পিঠে আরোহণ পূর্বক যাত্রা করলেন মদীনা পানে। পাষন্ড কাফিররা জানতে পারল। ফলে উম্মে সালামার কাবীলার লোকেরা এসে খুব গালি-গালাজ করলো আর বললো, তুমি যথা ইচ্ছা তথা যাও। কিন্তু আমাদের মেয়েকে যেতে দিব না। এই বলে নামিয়ে নিলো স্ত্রী উম্মে সালামাকে। ইতিমধ্যে আবু সালামার গোষ্ঠীর লোকেরা উম্মে সালামার কোল থেকে শিশু সন্তানটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো আর বললো-হতচ্ছারী! তুই যাবি তোর বাপের বাড়ি, আমাদের সন্তান নিবি কেন? আমাদের বংশের গৌরব আমরা-ই ধরে রাখবো, এই বলে শিশু পুত্রটিকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। আর উম্মে সালামাকে তার গোষ্ঠীর লোকেরা নিয়ে গেল আপন গৃহে। বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন হযরত

উম্মে সালামা (রাঃ) সে কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য। এরূপ অবস্থার মধ্যে আবু সালামাকে টলাতে পারেনি কেউ। তিনি উটের লাগাম ঘুরিয়ে দিলেন মদীনা পানে। মাওলাপাকের কি লীলা সন্তান এক জায়গায়, মাতা এক জায়গায় এবং পিতা আরেক জায়গায়।

স্বামী ও সন্তানের বিচ্ছেদের কারণে শুকিয়ে কঙ্কালের মত হয়ে গিয়েছিলেন উম্মে সালামা (রাঃ)। পানাহার বন্ধ করে দিয়েছিলেন প্রায়। **যেখান থেকে স্বামীর নিকট হতে তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিলো, প্রতিদিন সেখানে একবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিলাপ করে কাঁদতেন**। এভাবেই কেটে গেল একটি বৎসর। তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে সুহৃদয় ব্যক্তিদের দিলে হলো দয়ার উদ্রেক। তারা বললো, তুই পানাহার ছেড়ে দিয়েছিস, শুকিয়ে কঙ্কাল হয়েছিস, স্বামীর জন্য বিলাপ করছিস, আল্লাহর জমিনে আর কোন পুরুষ নেই? তোকে আবার বিবাহ দিবো। শরীরের কি হাল হয়েছে, আয়না দিয়ে দেখেছিস কখনও? একটু শরীরের যত্ন নিস। তখন তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন-আমার স্বামীর চাইতে আর কোন উত্তম স্বামী হতেই পারে না। যেহেতু প্রথম সারির মুসলমানের মধ্যে তিনি একজন। তিনি দুই হিজরতের অধিকারী। তারা বললো-রাখ্ তোর স্বামীর গুণ, যাবি তোর গুণধর স্বামীর কাছে? আনন্দে দোলা দিয়ে উঠলো হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) এর মন। তিনি বললেন, হ্যাঁ যাব। সবাই বলল, কেমনে যাবি? কার সাথে যাবি? তিনি বললেন, কারো দরকার নেই। তোমরা আমাকে একটি বাহন দাও। আল্লাহ্পাক নিজেই আছেন আমার সাথে, তিনিই (আল্লাহ্) আমাকে পৌঁছে দিবেন স্বামীর কাছে। পরীক্ষামূলক সবাই একটি উট এনে হাজির করলো, অমনি হালকা কিছু সামানাপত্র নিয়ে উম্মে সালামা (রাঃ) সওয়ার হলেন উটের পিঠে। আবু সালামার গোষ্ঠীর মধ্যেও কিছু সুহৃদয়বান ব্যক্তি ছিলো। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু কেউ প্রকাশ করেননি কাফিরদের ভয়ে। তাদের একজন এসে শিশু পুত্রটিকে উম্মে সালামার কোলে দিয়ে বললেন, তুমি এই নির্জন মরুভূমি পাড়ি দিয়ে কিভাবে পৌঁছিবে অতদূর রাজ্যে? তখন কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন উম্মে সালামা (রাঃ) "যারা আমার রাস্তায় মুজাহাদা করে, তারা যদি রাস্তা খুঁজে না-ও পায়, আমি তাদের জন্য নিজেই রাস্তা বের করে দেই।" নও মুসলিমগণ তাঁর এই ঈমানের দৃঢ়তা দেখে আশ্চর্য হলেন। মা ও সন্তানকে ছেড়ে দিলেন আল্লাহর নামে।

তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর তাঁর সহিত দেখা হলো এক হৃদয়বান ব্যক্তির সাথে। তাঁর নাম ছিলো উছমান ইবনে তালহা। তিনি

তখনও অমুসলিম। আদ্যপ্রান্ত সব কিছু শুনে বললেন, না, আম্মাজান! আপনাকে এভাবে একাকী মরুদস্যুদের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না। চলুন আমি আপনার উটের লাগাম ধরি। আপনি-বাচ্চাকে নিয়ে বসে থাকুন নিশ্চিন্ত মনে। যেই কথা সেই কাজ। পৌঁছে গেলেন, তিনি মদীনার কোবা পল্লীতে। যেখানে বসবাস করতেন তাঁর সৌভাগ্যবান স্বামী আবু সালামা (রাঃ)। এক বৎসর পর স্বামী-স্ত্রী এবং পিতা-পুত্রের মিলন হলে, কুঁড়ে ঘরে যেন নেমে এলো জান্নাতের শান্তি।

উছমান বিন তালহাকে হাতের কংকন খুলে দিলেন উম্মে সালামা (রাঃ)। উছমান দুঃখের সাথে বললেন, মায়ের উপকার করে সন্তান কি তার বদলা নেয় কখনো? আমি আপনাদের ধর্মকে মনে প্রাণে ভালবাসি। কিন্তু লোকে আমাকে কাপুরুষ বলবে বিধায় ইসলাম গ্রহণ করছিনা।

স্বামী-স্ত্রী ও শিশু পুত্রটিকে নিয়ে গড়ে উঠলো তাদের ছোট সুখের সংসার। নবী (সঃ) মদীনায় হিজরত করার কয়েক বৎসর পর কঠিন বিমারে আক্রান্ত হলেন আবু সালামা (রাঃ)। স্বামীর শয্যাপাশে থেকে হযরত উম্মে সালামা সেবা শুশ্রূষা করে সন্তুষ্ট করেছিলেন স্বামীকে। যখন তিনি বুঝতে পারলেন তিনি মৃত্যুর পথের যাত্রী, তখন তিনি বিবির গায়ে হাত দিয়ে দু'আ করলেন "হে আল্লাহ্ আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীকে আমার চাইতে উত্তমটি দান করো।" সত্যিই তার দু'আ কবুল হয়েছিল। হযরত আবু সালমার মৃত্যুর পর উম্মে সালামা (রাঃ) কে নবী (সাঃ) স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর স্বামীর দু'আর কি অপূর্ব বরকত। (উছদুল গাবা, সিরাতে ইবনে হিব্বান, তবাকাতে সা'আদ)।

স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা কত বড় অপরাধ

একদিন নবীজী (সাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-এর বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আপন-কন্যার মলিন মুখ দেখে তিনি কারণ সুধালেন উত্তরে হযরত ফাতিমা (রাঃ) বললেন, আমার স্বামী আমার উপর নারাজ। সাইয়্যিদুল কাওনাইন রাগন্বিতস্বরে ইরশাদ করলেন, "যার হাতে আমার জীবন। তাঁর কসম খেয়ে বলছি, স্বামীকে নারাজ রেখে তুমি যদি মারা যাও, তাহলে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ রাসূল) আমি তোমার জানাজায় শরীক হব না। এ কথা বলে তৎক্ষনাত নবীজী (সাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন নিজ গৃহে। পরদিন সকালে হযরত আলী (রাঃ) এসে নবীজী (সাঃ) কে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার স্ত্রী আমাকে সন্তুষ্ট করেছে, আপনিও তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তদ্দুত্তরে নবীজী ইরশাদ করলেন-শুধু আমি নই, আল্লাহ্ পাকও তার উপর খুশী হয়েছেন।" (কানজুল উম্মাল, তাবারী, সীরাতে ইবনে হিশাম)

স্বামীর প্রতি কি আশ্চর্য দরদ

আম্মাজান খাদীজা (রাঃ) রাসুল (সাঃ) ফিরে আসার সময় প্রথম ডাকেই বলতেনঃ "লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ" নবীজী (সাঃ) জানতে চাইতেন- "এত রাত, তুমি কি ঘুমাওনি খাদীজা?" খাদীজা বলতেনঃ "আল্লাহর রাসূল বাইরে পরিশ্রম করবেন, আর আমি ঘুমিয়ে পড়ব?" এই যে, প্রেম-ভালবাসার বিশাল সংসার, এর কি কোন তুলনা আছে? নেই। মুমীন দম্পতির জীবনে প্রেম-ভালবাসার আদর্শ-নমুনা রাসূল (সাঃ) স্বীয় জীবনাদর্শ দ্বারা উপস্থাপন করে গেছেন। তাঁর সে সকল নির্দেশনা ভালভাবে আমাদের অন্তরে গেঁথে নিতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কতিপয় বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ও সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন

স্বামী স্ত্রীর প্রেম-ভালবাসা ভিত্তিক দাম্পত্য সম্পর্ক ও মধুময় জীবন যাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত নিয়ম পদ্ধতি স্বামী-স্ত্রীর মেনে চলা কর্তব্য।

- স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে একে অপরের ঈমান-ইজ্জত, মান-সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে তৎপর হতে হবে। অপরের দ্বীনী ও আমলী সহযোগী হতে হবে।
- স্ত্রী তার স্বামীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। স্বামীর পরিশ্রম ও অবদানের মূল্যায়ন করবে। স্বামী তার স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করে চলবে। স্ত্রীর স্বাধীন সত্ত্বা ও মতামতের গুরুত্ব দিবে।
- স্বামীর সামর্থ ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে দেয়া জীবিকা ও পোশাক-আশাকে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। স্বামীও স্ত্রীর মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সাধ্যের ভিতরে কার্পণ্য করবে না।
- স্বামীর সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও খাটুনি দ্বারা জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থার কথা স্ত্রীর মনে রাখতে হবে এবং স্বামী কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তার বিশ্রামও আরামের ব্যবস্থা করতে হবে, হাস্যোজ্জ্বল বদন ও প্রেম-ভালবাসা দিয়ে তার মনে প্রশান্তি যোগাতে হবে। তেমনিভাবে স্ত্রীর সারাদিনের খুঁটি-নাটি কাজ এবং সংসার ও সন্তানাদি সামলানোসহ তিক্ত হবার মত ঝুট-ঝামেলার কথাটা স্বামীর মনে রেখে স্ত্রীকে গভীর ভাবে ভালবাসতে হবে।
- স্ত্রীর ভাল ও প্রশংসনীয় কাজ-কর্মের প্রশংসা স্বামীকে অবশ্যই করতে হবে এবং স্ত্রীকেও স্বামীর প্রশংসনীয় কাজের প্রশংসা করতে হবে। এই প্রশংসার ধরণ হবে উৎসাহ দান, স্বীকৃতি দান ও মূল্যায়ন করার মাধ্যমে।

- স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দ্বীনি কাজ-কর্মে উৎসাহিত করে যেতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে একে অপরকে উৎসাহিত করলে, আল্লাহর রহমাতের ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দু'আয় নিয়োজিত থাকেন। ফলে মহান আল্লাহ্ ঐ দম্পত্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে দেন এবং তাদের প্রেম-ভালবাসা গভীর করে দেন।
- স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে উভয়ের রুচি-পছন্দ জেনে নেবে এবং মানিয়ে চলার অভ্যাস করবে। একে অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি ক্ষমা করে ছাড় দিবে এবং বড় বড় দোষ ত্রুটির সংশোধনে হিকমতের সহিত যত্নবান হবে।
- স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পিছনে সমালোচনা করবে না। এটা গীবত। গীবতের মাধ্যমে ভালবাসার স্থানে শত্রুতা আসে, রহমতের স্থানে আসে অসন্তোষ।
- সংসারের সকল সদস্যের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী বিবেক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। বিবেকপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যেই পারস্পরিক ভালবাসা মধুর হবে।
- স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রতি উভয়ের নির্ভরতা ও আস্থা-বিশ্বাস থাকতে হবে। আস্থা ও বিশ্বাস ছাড়া অনাবিল সুখের আশা করা যায় না।
- স্বামী তার চরিত্র ঘরে বাইরে সর্বত্রই পবিত্র রাখবে এবং স্ত্রী ও তার চরিত্র তেমনি পবিত্র রাখবে। আর কেউ অপরের দোষ অন্যের কাছে বর্ণনা করবে না। মানুষদের নিকট নিজের সাথীর দোষ প্রকাশ পেলে, তাতে নিজেরই তো সম্মান নষ্ট হয়।
- স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পর্দা রক্ষা করে চলবে। স্ত্রীর পর্দার সীমা অধিক বিস্তৃত। তাকে গাইরে মাহরামদের সাথে দেখা দেয়া, রসালাপ প্রভৃতি পরিহার করে চলতে হবে। বাইরে বেরুতে আপাদ-মস্তক হিজাবে আবৃত করে হাত-পায়ে মোজা পরে বেরুবে। স্বামী ও স্বীয় দৃষ্টিকে হিফাজত করবে, চরিত্রকে নিস্কলুষ রাখবে।
- স্বামী নিজে যা পছন্দ করে না, তা স্ত্রীকে দিয়ে করাবে না, তেমনি ভাবে স্ত্রী যা পছন্দ করে না, তা করতে স্বামীকে বাধ্য করবেনা। আর প্রত্যেকেই অপরের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে দূরে থাকবে।
- স্বামী-স্ত্রী ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখবে এবং কম হলেও প্রসাধনীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করতে হবে।
- স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক ও অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে। পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ-কর্ম ও দায়-দায়িত্ব সবই আঞ্জাম দেবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে।

স্বামী বা স্ত্রী প্রয়োজনে দূরে কোথাও গেলে, তাতে বেশী দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে না। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একত্রবাস গ্রহণ করবে।

❐ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে প্রতিদান আশা করার চেয়ে নিঃস্বার্থ মনোভাবই কাম্য। অবশ্য মহান আল্লাহর নিকট থেকে পরকালীন পুরস্কারের আশা করতে পারে।

শরী'য়াতের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত-মুস্তাহাব পালনে স্বামী-স্ত্রীকে তৎপর হতে হবে এবং সকল প্রকার গুণাহ থেকে দূরে থাকতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক কর্তব্য পালনেও সজাগ হতে হবে।

এভাবে স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য ও নিয়মাবলী মেনে চলার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও শান্তিময় করে তুলতে পারে।

স্বামীকে কষ্ট দেয়ার ফল ভাল নয়

যদি কোন স্ত্রী স্বামীকে কষ্ট দেয় আর আসমান-জমিনের যাবতীয় অধিবাসী সমতুল্য নেকী অর্জন করে ফেলে, তথাপি আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলবেন-উক্ত স্ত্রী লোককে হাত-পা বেঁধে এবং চেহারা বিকৃত করে দোযখে নিক্ষেপ কর।

উত্তম স্ত্রী কে?

জনৈক সাহাবী রাসূলে করীম (সঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, সবচেয়ে ভাল স্ত্রী কে? হুযুর আকরাম (সঃ) বললেন (১) যে স্ত্রীকে দেখলে স্বামীর নয়ন জুড়ায় (২) যে স্ত্রীকে আদেশ করা মাত্রই স্বামীর আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করে (৩) যে স্ত্রী তার ইজ্জত বা স্বামীর সম্পত্তি সম্পর্কে স্বামীর বিনা হুকুমে বা স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না।

স্বামী-স্ত্রীর জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম

মুসনাদে আহমদ নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত হুসাইন ইবনে মুহসিন (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "আমার ফুফু আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি একদা মহানবী (সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হলাম। যখন আমি আমার কথা পূর্ণ করলাম, তখন নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, তুমি কি বিবাহিতা? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার (স্বামীর) সাথে তোমার আচরণ কেমন? আমি বললাম, তার আনুগত্যে আমি কোন প্রকার অবহেলা করি না, তবে নিজের পক্ষ থেকে কোন কাজ করতে অক্ষম হওয়া ব্যতীত। ইরশাদ করলেন, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ, তুমি তার সাথে কেমন আচরণ করছ? কেননা, সে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উক্ত মহিলাকে যে উপদেশ দিলেন, তার সার কথা হচ্ছে-তুমি নিজেকে ভাল করে দেখে নাও, স্বামীর নিকট তোমার অবস্থান কোন্ পর্যায়ের? তুমি স্বীয় স্বামীর অধিকার আদায় করছ কি-না? এটাই তোমাকে জান্নাতে পৌঁছানোর কারণ হবে। আর যদি স্বামীর হক আদায় করতে অবহেলা কর, তাহলে এটাই তোমাকে জাহান্নামে পৌঁছানোর কারণ হবে।

স্বামী-স্ত্রীর নেকী অর্জনের সহজ পন্থা

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ভালবাসায় যা কিছু করে, তাতে সদ্‌কার ছাওয়াব তাদের আমলনামায় লিখা হয় বলে হাদীস শরীফে রয়েছে। এমনকি তাদের যৌন মিলনেও তারা ছাওয়াব লাভ করে বলে হাদীসে বলা হয়েছে। আবার স্বামী মহব্বত স্বরূপ স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা তুলে দিলে তাতেও সে ছাওয়াবের অধিকারী হয়। কেননা এতে স্ত্রী আনন্দ উপভোগ করবে এবং বুঝতে পারবে স্বামী তাকে কত ভালবাসে। আসলে স্ত্রীর মন খুশী করা অনেক সওয়াবের কাজ। তেমনি স্বামীর মন জয় করা, স্বামীর মুখে ভালবেসে খাবার তুলে দেয়াও স্ত্রীর জন্য সওয়াবের কাজ। স্বামীর খাওয়া দাওয়া, পোশাক-আশাক, সন্তান সন্ততির লালন পালন করা ইত্যাদির প্রতি যত্নবান হওয়া, স্বামীর অবর্তমানে স্বামীর সম্পদ হেফাজত করা স্ত্রীর জন্য সওয়াবের কাজ। তেমনিভাবে সংসারের ভরন-পোষণে (মালী বন্দেগীর ধারা ঠিক রেখে) স্বামী যা কিছু খরচ করে, তাতে সে সদ্‌কার ছওয়াব পায়।

অনুরূপভাবে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মহব্বত ও খিদমত দ্বারা অজস্র ছাওয়াব লাভ করে। সে স্বামীর সংসারের তদারকী-ব্যবস্থাপনা, রান্না করা, ঘর ঝাড়ু দেয়া, কাপড় ধোয়া প্রভৃতি সাংসারিক সকল কাজে ছাওয়াব লাভ করে।

স্ত্রীকে কতিপয় বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ও সচেষ্ট থাকা দরকার

❐ স্বামীর হক সবচেয়ে বড় মনে করা ❐ স্বামীকে অন্যায়ভাবে কষ্ট বা মনে ব্যাথা না দেয়া। ❐ স্বামীর ডাকের সংগে সংগে সাড়া দেয়া ❐ স্বামীকে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বরণ করা। ❐ স্বামীর অবাধ্য না হওয়া। ❐ যথাসাধ্য স্বামীর খিদমত করা। ❐ স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। ❐ স্বামীকে তুচ্ছ জ্ঞান না করা। ❐ গায়ের জোরে একটি দেশ জয় করা যায়, কিন্তু মন জয় করা যায় না। তাই স্বামীর মন জয় করার জন্য স্ত্রীকে মনোনিবেশ করতে হবে।

সর্বপ্রথম দ্বীনের হুকুম মান্য করে পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের জন্য নিবেদিত প্রাণ থাকতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধির উপায়

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে গভীরভাবে পাওয়ার জন্য এবং দু'জনের মাঝে গভীর ভালবাসা সৃষ্টির জন্য উপহার বিনিময় করবে। স্বামী তার সাধ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে মাঝে মাঝে চিত্তআকর্ষণ উপহার দিবে। স্ত্রীও তার সাধ্যানুযায়ী স্বামীকে মাঝে মাঝে উপহার প্রদান করবে।

রাসুল (সঃ) বলেছেন "তোমরা পরস্পর উপহার আদান প্রদান কর, এর ফলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি হবে"।

স্ত্রীদের আরাম আয়েশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে

হাদীসে আছেঃ- হযরত আয়শা বলেন-একদিন মহানবী (সাঃ) রাতের বেলায় কবরস্থানে যাওয়ার জন্য আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠলেন, আস্তে আস্তে জুতা পরলেন এবং আস্তে আস্তে দরজা খুললেন। হযরত আয়শা এর কারণ জানতে চাইলে জবাবে রাসুল (সাঃ) বললেন ইহা এই জন্য করেছি যাতে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।

স্বামীর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা প্রয়োজন

স্বামীর জিনিসপত্র সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। বসবাসের কক্ষগুলো পরিস্কার করে রাখবে যেন দুর্গন্ধময় পরিবেশ সৃষ্টি না করে। পোষাক-পরিচ্ছদ বা ব্যবহার্য বিষয়াদি ময়লা ও কুচকে না হয়ে যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। বালিশ ও শোফার কভার আবর্জিত হওয়ার পূর্বেই পাল্টে ফেলবে।

এসব কাজ স্বামী বলার পর যদি তুমি কর, তাহলে ব্যাপারটি কেমন হলো? আন্তরিকতার প্রমাণ তো সে কর্মে প্রতিপন্ন হবে-যে কর্মে মুখে উচ্চারণের পূর্বে স্বেচ্ছায় সম্পন্ন করা হবে। তোমার হিফাজতে যে জিনিসগুলো রয়েছে, সেগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখ। কাপড় থাকলে তা সুন্দরভাবে ভাজ করে রাখ এবং যেখানে সেখানে এলোপাতাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখ না বরং যেখানেই রাখ না কেন, তার একটি চিহ্ন নিজের কাছে রেখ। কোন কর্মে নিজকে দূরে রাখার ও নিজ কর্ম অন্যের দ্বারা করানোর পন্থা খুঁজে বেরিও না। কোথাও ভুল হলে মিথ্যার আশ্রয় নিবে না, তাহলে তোমার সত্য কথাও পরে বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

সুখে দুঃখে পিতা মাতার পরে স্ত্রীই সাথী হন

জনৈক ব্যক্তির ডায়রিয়া দেখা দিল। ডায়রিয়ার দুর্গন্ধে পুত্র এবং পুত্রবধু সবাই নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে আলাদা হয়ে গেল। তখন বৃদ্ধের স্ত্রীর সেবার অবস্থা ছিল এই যে, স্বামীকে স্বীয় পদযুগলের উপর বসিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করাতো এবং নিজে সে সমস্ত ময়লা ধুইয়ে মুছে পরিস্কার করতো। প্রত্যহ ডায়রিয়া জনিত কারণে ২০/২৫ বার দাস্ত হতো, আর প্রতিবার তার স্ত্রী সেগুলো পরিস্কার করে স্বামীকে বিছানায় শুইয়ে দিতো। সুতরাং পোশাকের মত স্বামী-স্ত্রী কোন স্বতন্ত্র সত্তা বা বস্তু নয়, তাই স্ত্রীর সহযোগী স্বামী আর স্বামীর সেবিকা স্ত্রী।

মহিলারা শুধু ঘরের দেখাশুনার কাজের ভিতর নিজকে সীমাবদ্ধ করে রাখে না; বরং নিজ হাতে তারা কাজও করে থাকে। বিশেষ করে তারা শিশু সন্তানদের প্রতিপালনে অতি বেশি কষ্ট স্বীকার করে থাকে। এই কাজটি এত অধিক গুরুত্বপূর্ণ যা কোনদিন বেতনভুক্ত চাকর-চাকরানী দ্বারা তার সমপর্যায় আশা করা যায় না।

শত অভাব-অনটন ও দরিদ্রতার কষাঘাতে মানুষ যখন জর্জরিত হয়, তখন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন দূরে চলে যায়; কিন্তু সে মুহূর্তে স্বামীর পাশে সার্বক্ষণিকভাবে একমাত্র স্ত্রীই থাকে। অনুরূপ রোগ শয্যায় শায়িত হলে সেবা শুশ্রূষার দ্বারা যে পরিমাণ প্রশান্তি স্ত্রীর দ্বারা লাভ হয়, তা কি আর কারো থেকে পাওয়া যায়? তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় স্ত্রীর মত আপন বন্ধু এ জগত সংসারে আর কেউ নেই।

প্রতিদিন স্ত্রীরা স্বামীর জন্য যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তেমনটি আর কেউ করে না। স্ত্রীরা স্বামীকে পূর্বে না খাইয়ে নিজেরা আগে ভাগে কখনো খাদ্য স্পর্শ করে না। এমনকি মেহমান বেশী হলে নিজেরা না খেয়ে তাদের খাবার মেহমানকে দিয়ে অভুক্ত থাকে। মেহমান খাবার শেষে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাই হয় তাদের আহার; নতুবা অনাহারে কাটিয়ে দেয়।

স্বামী কোথাও সফর থেকে অর্ধরাত্রিতে বাড়ি ফিরলে তখন স্ত্রী নিজের ঘুম হারাম করে, নিজের সুখ দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে খাবার পাকাতে যায় এবং তার সেবা যত্নে লেগে পড়ে।

আমাদের দেশের মহিলাদের সমস্ত হৃদয় জুড়ে এমনকি তাদের শিরা-উপশিরায় স্বামীর প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত। তবে সেই সাথে বক্রতাও তাদের আছে। নিজের যবানকে তারা সংবরণ ও সংযত করে রাখতে পারে

না। কিন্তু তাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলী এমন অপূর্ব যে, সেগুলোর জন্য তাদের মান অভিমান ও বক্রতা বিনা প্রশ্নে মাথা পেতে নেয়া উচিত। স্ত্রী তো স্বামীর জন্য মাতা-পিতা এবং সমস্ত বংশধর ত্যাগ করে এসেছে, এখন তুমিই একমাত্র তার অবলম্বন, তুমিই তার আশা-ভরসা ও কামনা-বাসনা এবং একমাত্র সম্বল। সুতরাং মানবতা ও ভদ্রতার দাবী এটা যে, এমন একজন বিশ্বস্ত নিবেদিত বন্ধুকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়া। তার থেকে শিষ্টাচার বহির্ভূত কোন আচরণ প্রকাশ পেলে সেটাকে তার অভিমান মনে করা চাই। কেননা, তাদের বুদ্ধি বিবেচনা কম বলেই তারা স্বামীর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব উপলব্ধিপূর্বক কথা বলতে পারে না। তবুও স্বামী ছাড়া আর কার সাথে সে মান-অভিমান করবে? এ দুনিয়াতে তুমি ছাড়া তাদের আর কে আছে?

স্ত্রীকে কিছু হাত খরচ দেয়া প্রয়োজন

মৌলিক প্রয়োজনের চাইতে অতিরিক্ত আরও কিছু খরচ স্ত্রীকে দেয়া প্রয়োজন-যাকে হাত খরচা বলে। এর নির্ধারিত অংক নির্দিষ্ট হবে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে। ২০/৫০/১০০ যখন যা সম্ভপর হয়, তা আলাদাভাবে দিয়ে স্পষ্ট করে বলে দিবে এই টাকা গৃহের এবং এই টাকা তোমার নিজের খরচ বাবদ দিলাম-এটার মালিকানা সম্পূর্ণ তোমার। যেখানে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা এ থেকে খরচ করার অধিকার তোমার আছে।

একটি মজার কাহিনী

জনৈক মহিলা এসে কোন এক বুযুর্গের নিকট স্বামী যেন তার প্রতি (সাথে) বিনম্র ও সহানুভূতিশীল হয় এজন্য তাবিজ চাইলে উক্ত বুযুর্গ কিছু পানি নিয়ে তাতে কিছু না পড়ে তাকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, "এ পানি বোতলে পুরে রেখে দিবে। যখন তোমার স্বামী ঘরে আসবে, তখন এ পানি থেকে সামান্য কিছু মুখে নিয়ে বসে থাকবে এবং সে ঘর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত পানি মুখেই রাখবে। ফলে তোমার স্বামী পানির মত হয়ে যাবে।" মহিলা এমনই করলো। স্বামী যখন ঘরে আসতো, তখন সে ঐ বোতল থেকে কিছু পানি মুখে পুরে রাখতো, ফলে কিছুদিন পর স্বামী তার প্রতি বিনম্র ও সহানুভূতিশীল হয়ে গেল।

উক্ত মহিলা এরপর বুযুর্গের দরবারে কিছু হাদীয়া তোহফা পেশপূর্বক বললো, "আপনার তাবিজের কারিস্মায় এখন আমার স্বামী আর আগের মতো রুক্ষ ব্যবহার করেন না।"

বুযুর্গ মুচকি হেসে বললেন, "সেটাতো একটি কৌশল ছিল মাত্র, ঝাড়-ফুঁকের কিছুই ছিল না। আমি অনুমান করে বুঝে নিয়েছিলাম যে তুমি তোমার স্বামীর প্রতি রুক্ষ ভাষা ব্যবহার কর আর সে জন্য তোমার স্বামী দুর্ব্যবহার করে। আমি তোমার ঐ কথা বন্ধ করার জন্য পানি মুখে রাখাকে কৌশল গ্রহণ করেছিলাম মাত্র। তাই এখন থেকে আর স্বামীর সাথে তর্কে লিপ্ত হবে না। তোমার টাকা ও মিষ্টি তুমি ফেরৎ নিয়ে যাও, আমি এটা গ্রহণ করতে পারলাম না।" বস্তুতঃ মুখের ভাষাই সর্বপ্রকার বিরোধ ও অনিষ্টতার মূল। সুতরাং আল্লাহ্পাক যেমন নারীকে স্বামীর অধীন বানিয়েছেন, তেমনি স্বামীর অধীনতা স্বীকার করে নেয়া এবং নিজকে স্বামীর চাইতে উত্তম না মনে করা উচিৎ। স্বামী যদি ভুলেও ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে থাকে তবু তার সামনে কখনো কটুবাক্য উচ্চারণ করোনা। যখন তার ক্রোধ ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন তোষামোদির ভাষায় তাকে বুঝাও যে, তখনতো বলিনি এখন বলছি, আমার উপর আপনি অযথা উত্তেজিত হয়েছিলেন, আপনার এ উত্তেজিত হওয়াটা অহেতুক ছিল। এভাবে কথা বললে কথা আর বাড়বে না; বরং স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।

জনৈক ব্যক্তির কাহিনী

জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল এমন উগ্র স্বভাবের যে, তাকে অশ্রাব্য অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতে দ্বিধা করতো না। আচার-ব্যবহারে তাঁকে সীমাহীন কষ্ট দিতো। কিন্তু তিনি নিদারুণ স্পর্শকাতর স্বভাবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিরবে তা সহ্য করে যেতেন। কখনও তাকে তালাক দেয়া তো দূরের কথা, বিন্দু পরিমাণ কষ্ট দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। বরং তার প্রতি এই পরিমাণ যত্নশীল ছিলেন যে, বেগম সাহেবার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য প্রতিদিন ভোরে খাদিমকে পাঠিয়ে দিতেন। খাদিম খোঁজ-খবর নিতে গেলে সে তার স্বামীকে বকাঝকা করে দিতো। খাদিম তার কাছ থেকে ফিরে এসে এজন্য কোন অভিযোগ না করে শুধু বলতো তিনি ভাল আছেন।

একবার তিনি স্ত্রীর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য একজন খাদিমকে পাঠালেন। সে তার কাছে গিয়ে কথাবার্তা শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে গেল এবং হযরতের নিকট ফিরে এসে অভিযোগ করলো-"তিনিতো আপনাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন এতদসত্ত্বেও আপনি কিভাবে তাকে এত আদর যত্ন ও সমীহ করেন? উত্তরে তিনি বললেন, "তাকে এভাবে

বিদ্রুপের সাথে বলো না! সে আমার বড়ই মুহসিন-হিতাকাংখী। আমি যতটা শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা লাভ করেছি, তা তারই বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। তার দুর্ব্যবহার নিরবে হজম করে নেয়ার কারণেই আল্লাহপাক আমাকে এ নেয়ামতে মন্ডিত করেছেন।"

মহিলাদের ভিতরে তিনটি গুণ থাকা অত্যন্ত জরুরী

স্ত্রীর উপর স্বামীর আদেশ পালন কর্তব্য। যে নারী স্বামীর নাফরমান এবং স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট, এমন নারী আল্লাহর রহমত হতে বহু দূরে থাকবে, যতক্ষণ সে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট না করবে। যে রমনীর মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, সেই নারীর প্রতি তার স্বামী কখনও অসন্তুষ্ট হবে না। শেখ সাদী (রঃ) বোস্তার একটি বয়াতে গুণ তিনটি একস্থানে বর্ণনা করেন।

'সুশ্রী' তাবেদার ও দ্বীনদার নারী,
দরিদ্র স্বামীকে করে রাজ্যের অধিকারী'

শেষোক্ত গুণ দু'টি মানুষের আয়ত্বে। যদি কোন রমণীর মধ্যে প্রথমোক্ত গুণটি না থাকে, তবে শেষোক্ত গুন দু'টি বিদ্যমান থাকলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুমধুর ও সুখময় হবে। আর যদি প্রথমোক্ত গুণটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শেষোক্ত গুণ দু'টি বিদ্যমান না থাকে, তবে এমন নারী দুনিয়াতেও বদনামের ভাগী এবং পরকালে তার জন্য কঠোর আযাব রয়েছে। যে সংসারে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সুমধুর, সে সংসার যদিও দারিদ্র ও অভাব-অনটনের হয়, তবুও তা ধন–ভান্ডার ও শাহী মহল হতে শতগুণে উত্তম।

কোন কোন সময় এটাও সম্ভব যে, তোমার ধারণা মতে স্বামীর অসন্তুষ্টি একবারেই অকারণ এবং এমনও হতে পারে যে, বাস্তবে তোমার ধারণাই সত্য; এমতাবস্থায়ও অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে সহ্য করবে। এমনকি তোমার কথায় তো দূরের কথা, ইশারা–ইঙ্গিতেও যেন প্রকাশ না পায় যে, তার ক্রোধ করা অন্যায় এবং রাগ করা অমূলক ছিল। তোমার এই ধৈর্য্য অবশেষে এক দিন তাকে অবহিত করবে যে, তার এই রাগ অকারণে ছিল। এর পরিণতি অতীব শুভ এবং তোমার প্রতি অত্যাধিক দয়া ও মেহেরবানীর কারণ হবে। এরূপ ব্যবহারে তো শত্রুও মিত্র হয়; আর স্বামী তো স্বামীই। অবশ্য এই ধৈর্য্য ধারণকালে এদিকে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখ যেন, তোমার চোখ ভ্রু-কুঞ্চিত না হয়; বরং প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকবে। কথাবার্তায় চালচলনে কিছুতেই যেন অসন্তুষ্টির ভাব

ফুটে না ওঠে। স্বামীর সাথে কথাবার্তা বলার সময় তার মর্যাদার ও মর্তবার প্রতি খুব খেয়াল রাখ। মনখোলা কথাবার্তা বলার সময়ও এদিকে লক্ষ্য রাখ। সম্বোধনে এমন শব্দ কিছুতেই ব্যবহার করবে না, যদ্দারা বেআদবি বুঝে আসে। স্বামী কোন কথা বললে প্রথমে খুব মন দিয়ে শুন, তারপর আদব সহকারে যথাযথ উত্তর দাও। উত্তর অতি উচ্চস্বরেও দিবে না, আবার নিম্নস্বরেও দিবে না যে, আওয়াজ শুনা না যায়। স্বামী যদি কোন ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হন কিংবা ভুল বুঝে থাকেন, তবে ঐ ঘটনা সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি অতি আদব ও ভক্তি সহকারে খন্ডন করতে চেষ্টা কর। এমন শব্দ প্রয়োগ করবে না যাতে স্বামীর প্রতি ঐ ব্যাপারে অজ্ঞতার কটাক্ষ হয়। আর যদি মানবতা সুলভ দুর্বলতার কারণে তোমার দ্বারা কোন প্রকার ভুল–ভ্রান্তি হয়ে যায়, অথবা কোন কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে পড়ে, তবে তা স্বীকার করে মাফ চেয়ে নেবে, এর ফল হবে অতীব শুভ। স্বামীর কাছে যদি কোন কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয় দ্বীনি মাসআলা বিষয়কই হোক কিংবা সাংসারিক কোন কথা হোক, তবে তা পরিস্কার ও স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস কর এবং ভালরূপে বুঝে নিশ্চিত হবেন।

শ্বশুর বাড়ির লোকদের সাথে আচার-ব্যবহার

নিজের স্নেহময়ী মাতার ন্যায় প্রত্যেক কাজে শাশুড়ীর আদর করবে এবং সর্বাবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টি অগ্রগণ্য মনে করবে। তোমার যতই কষ্ট বা আরাম হোক না কেন, কিন্তু তাঁর মর্জির বিপরীত এক পাও আগে বাড়াবে না। মুখে এমন কোন কথা উচ্চারণ করবে না, যাতে তাঁর কষ্ট হয়। তাঁর সাথে যখন কথা বলবে কিম্বা তাঁকে যখন সম্বোধন করবে, তখন নিজের সমকক্ষদের সাথে যেরূপ সম্বোধন করবে সেরূপ করবে না; বরং মুরব্বীদের জন্য যে শব্দ প্রয়োগ করা উচিত তাই ব্যবহার করবে। তোমার শাশুড়ী যদি কোন কাজে তোমাকে তাম্বীহ্ করেন, তবে তা নীরবে শুনবে; যদিও মনের বিপরীত এবং কটু কথাও বলেন (যা আশা করা যায় না), তবুও সুস্বাদু শরবতের ন্যায় অনায়াসে পান করবে (সহ্য করবে)। খবরদার! কস্মিনকালেও কঠোরভাবে প্রতি-উত্তর করবে না। নিজের মায়ের সমতুল্য তাঁর খেদমত করবে। তিনি যদি অন্য কারো কোন কাজের আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ সে কাজ তুমি নিজেই করে ফেলবে। মেহেরবান পিতার ন্যায় শ্বশুরের তা'যীম ও শ্রদ্ধা করবে। শাশুড়ীর সাথে কথা-বার্তা বলার যে আদব কায়দা লিখেছি, শ্বশুরের বেলায়ও সে দিকে লক্ষ্য রাখবে,

তাঁকে আরাম পৌছানোর এবং তাঁর খেদমতের যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

শ্বশুর বাড়ীর কোন মহিলা যদি বয়সে তোমার চেয়ে বড় হয়, যেমন স্বামীর বড় ভাইয়ের বিবি তাঁর সাথে কথাবার্তা উঠা-বসায় তাঁর মর্তবার প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং তার সাথে দুধ-মিশ্রির মত এমনভাবে মিলেমিশে থাকবে যেন উভয়ে সহোদরা ভগ্নীদ্বয়, একজন বড় ও একজন ছোট। যদি তুমি এমন ব্যবহার কর, তবে অপর পক্ষও তোমার সাথে এরূপই ব্যবহার করবে। আর যদি সে বয়সে ও মর্তবায় তোমার চেয়ে ছোট হয়, তবে তার সাথে স্নেহ ও মহব্বত সুলভ ব্যবহার করবে এবং তাকে অতি নম্র ও শান্ত ভাবে ভাল ভাল কথা শিক্ষা দিতে থাকবে। সে কোন কাজ করতে আরম্ভ করলে তুমি নিজে উদ্যোগী হয়ে তার সহায়ক হয়ে ঐ কাজ সমাধা করবে। অনুরূপ স্বামীর ভগ্নী, ভাগিনী ইত্যাদির সাথে যার যার মর্তবা অনুযায়ী সম্ভ্রম ও নম্র ব্যবহার করবে।

বাড়ীতে যেসব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তোমার শ্বশুরের হোক বা বাড়িতে অবস্থানকারী অন্য কোন আত্মীয়েরই হোক, তাদের সাথে অতিশয় স্নেহমমতা সুলভ ব্যবহার করবে।

হাদীস শরীফে আছেঃ "যে ব্যক্তি বড়দের আদর করে না ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

ঘরের জিনিসপত্র যথা স্থানে রাখা উচিত

ঘরের জিনিসপত্রগুলো স্ব স্ব স্থানে গুছিয়ে রাখাও সংসারিক সুব্যবস্থার অন্যতম কাজ। যে জিনিস যেখানে রাখার যোগ্যতা সেখানে রাখাও সঙ্গত। বিছানাপত্র, চৌকি, পালঙ্ক যথাস্থানে রেখে দাও। প্রয়োজনবোধে কোন জিনিস রক্ষিত স্থান হতে বের করলে পরে কাজ শেষে আবার সেই বস্তু সেখানেই রেখে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এরূপে দৈনন্দিন ব্যবহারিক থালা-বাসন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। এমন যেন না হয় যে ঘটি একস্থানে গড়াগড়ি খাচ্ছে, রেকাবি অন্যস্থানে পড়ে রয়েছে, ডেকচি আঁধোয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মাছির ঝাঁক বিন্‌বিন্ করছে। এদিকে পানির কলসীর মুখ খোলা পড়ে রয়েছে। কিনারে দাঁড়িয়ে কাক পানি পান করছে এবং পায়খানা করে নষ্ট করছে।

কাপড়গুলো সব সময় ভাঁজ করে রাখবে। এমন যেন না হয় যে, কাপড়-চোপড় এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকে।

স্বামীর হুকুম পালনের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে জনৈক সাহাবী স্বপরিবারে ঘরের দোতালায় বসবাস করতেন। নীচ তলায় তার স্ত্রীর পিতা-মাতা বাস করতেন। উক্ত সাহাবী বিশেষ কাজে কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় স্ত্রীকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি দিয়ে কঠোর হুকুম প্রদান করলেন-"আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘর ছেড়ে নীচে নামবে না।"

কিছুদিন পর উক্ত স্ত্রীলোকটির পিতার কঠিন বিমার হলো। পিতাকে দেখার জন্য স্ত্রীলোকটি নবীজীর (সঃ) নিকট লোক পাঠিয়ে ইজাযত চাইলে তিনি ইরশাদ করলেন-স্বামীর হুকুমকেই তার অগ্রে স্থান দিতে হবে।

ঘটনাক্রমে সেই রোগে মেয়েলোকটির পিতা ইন্তেকাল করলেন। নারী দেলে উথলে উঠলো পিতৃস্নেহ। পিতার চেহারা দর্শনার্থে পুনরায় তিনি নবীজীর স্মরনাপন্ন হয়ে ইজাযতের জন্য লোক পাঠালেন। সাইয়্যিদুল মুরসালীন (সাঃ) পূর্বের মত একই কথা বলেন, স্বামীর আদেশের মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। স্বামীর হুকুম ছাড়া দোতলা থেকে নীচে নামা যাবে না। ফলে তিনি সবর ও ধৈর্য্য অবলম্বন করলেন।

স্বামী ঘরে ফেরার পূর্বেই নবীজী (সাঃ) মেয়েলোকটিকে সুসংবাদ প্রদান করলেন- আল্লাহ্ তা'আলা তোমার স্বামীর আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে তোমার পিতাকে ক্ষমা করে জান্নাত দান করেছেন। (এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ২য় খন্ড)

কন্যা সন্তান হওয়া এবং নিঃসন্তানী হওয়ার জন্য স্ত্রীরা দায়ী নয়

স্বামীর এমন রুক্ষ মেজাযের হওয়া উচিৎ নয় যে, স্ত্রীর সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিকে অবলম্বন করে উত্তেজনায় ফেটে পড়বে। অনেকে তো আবার স্ত্রীকে এমন বিষয়ে অভিযুক্ত করতে থাকে যেখানে স্ত্রীর কোনই দখল নেই। এটা মারাত্মক ভুল। যেমন অনেকে স্ত্রীর কন্যা সন্তান হলে বলে তুমি হতভাগী, তোমার কোন পুত্র সন্তান হয় না কেন? বেচারীর এখানে কি অন্যায়? সন্তান হওয়া না হওয়া কি তার ক্ষমতার আওতাভুক্ত কোন কিছু? রাজা-বাদশাহ ও বিত্তশালীদের সন্তান-সন্ততি না হলে তারা প্রোটিনসমৃদ্ধ ও সন্তান লাভে সহায়ক ঔষধ গ্রহণ করে থাকে; কিন্তু তাও কোন কাজ দেয় না। সন্তান হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণই আল্লাহ্‌পাকের নিয়ন্ত্রনাধীন। এখানে স্ত্রীর ক্ষমতা ও অপরাধ কোথায়? উপরন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করালে এখানে পুরুষের ত্রুটি বেরিয়ে আসা বিচিত্র কিছু নয়। আর আল্লাহ্‌তা'আলা যাকে কোন সন্তানই দান করেন না-না কন্যা সন্তান-না পুত্র সন্তান, তার জন্য তাই মঙ্গল। কারণ মানুষের কল্যাণ কোনটির মধ্যে তা তিনিই ভাল জানেন।

স্বামীর বার্ধক্য অবস্থায় খেদমতের প্রতি বেশী মনোযোগী হওয়া উচিৎ

মানুষ যখন বার্ধক্যতায় পতিত হয়, তখন নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, অথবা স্বাভাবিকভাবে দুর্বল হতে থাকে। তাই আপন স্বামীকে বৃদ্ধাবস্থায় খিদমত করার জন্য সর্বদা শয্যা পার্শ্বে থাকা উচিত। তবেই আল্লাহর বেশী নৈকট্য লাভ করা যাবে। বহু স্ত্রীলোক আছে, যারা আপন স্বামীর খিদমত থেকে দূরে থাকে। যদিও যৌবনকালে (সখ করে) কিছু দিন খেদমত করে থাকে, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে খেদমত থেকে একেবারেই দূরে থাকে। তা কখনও উচিত নয়। বরং বৃদ্ধাবস্থায় স্বামী খিদমতের বেশী মুহতাজ বলে তখন তার খিদমতে যথাসাধ্য বেশী মনোযোগ দিতে হবে।

শাশুড়ীর খেদমত না করায় নবীজী (সাঃ) এর ধমক

হযরত জিরার ইবনে আদী (রাঃ) এর স্ত্রী হযরত নাফিছা (রাঃ) নবীজীর দরবারে গিয়ে জানালেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আমার পুত্রবধূ আমার উপর জুলুম করছে। উত্তরে নবীজী (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন–কি ধরনের জুলুম করছে? তিনি বললেন, আমাকে ছেঁড়া তাবুতে বসবাস করতে দেয়, আর আমাকে পানাহার করতে না দিয়ে স্বামী ও সন্তান-সন্তুতি নিয়ে ভালভাবেই পানাহার করে এবং আরামদায়ক বিছানায় শয়ন করে। কালক্ষেপন না করে নবীজী (সাঃ) তলব করলেন সেই পুত্র ও পুত্রবধূকে। আদ্যপ্রান্ত সবকিছু শোনার পর নবী (সাঃ) তাদেরকে গম্ভীর স্বরে ইরশাদ করলেন–" তোমরা কি জাহান্নামের বেড়ী গলায় পরিধান করতে চাও?" তারা 'না' সূচক জবাব দিলেন। অতঃপর নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন–"খাছভাবে তাওবা কর। সাবধান! এরূপ আর কখনও করবে না। ছেলেকে নবীজী (সাঃ) বললেন–"ভুলে যেওনা–তিনি তোমার গর্ভধারিণী মা।" আর পুত্রবধূকে বললেন "স্বামীর মাকে তুমি নিজের মায়ের মত দেখবে। কেননা তিনি তোমার মাতৃস্থানীয়া।"(লুবাবুন নুকুল)

শাশুড়ীর খেদমত না করায় হযরত আলী (রাঃ) এর বেত্রাঘাত

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) -এর শাসনামলে বনী গাতফান গোত্রের এক বিধবা রমণী কুয়া থেকে পানি তুলে অন্য লোকের বাগানে দিচ্ছিলেন। খলীফাতুল মুসলিমীন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–এই বৃদ্ধ বয়সে এত কষ্ট করছেন কেন? আপনার সন্তানরা আপনার খবরগীরী করছে না?

বিধবা বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! বার্ধক্যের কারনে চল্যশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। সন্তানরা অনেক দুরে থাকে। পুত্রবধূরা আমাকে খেতে দিচ্ছে না।" এ কথা শুনে আলী (রাঃ) এ বিধবা রমণীর পুত্রবধূদের ডাকালেন। সাক্ষী-প্রমাণের মাধ্যমে কথার সত্যতা যাচাই করে কাজীউল কুজাতের রায় অনুযায়ী উক্ত পুত্রবধূদেরকে দশটি করে বেত্রাঘাতের হুকুম দিলেন। তিনি আরো শাসিয়ে বললেন–শাশুড়ী তোমাদের মাতৃ স্থানীয়া। তার খিদমত করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। (তাবারী ৮ম খন্ড আসাহুস সিয়ার)

স্ত্রীদের প্রতি নছিহত–১

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) গুরুত্বপূর্ণ অমূল্য উপদেশ প্রদান করেছেন, যার মাধ্যমে স্ত্রীদের জীবন সুন্দর ও সুখী হতে পারে।

- স্বামী যদি কখনো তোমার উপর রাগান্বিত হয়, তবে তুমি এমন কোন কথা বলবেনা বা এমন কোন ব্যবহার করবে না-যাতে তার রাগ আরো বৃদ্ধি পায়। বরং এমন ব্যবহার করবে, যাতে তার রাগ নিঃশেষ হয়ে যায়। সব সময় মাথা খাটিয়ে মেজাজ বুঝে কথা বলবে।
- যদি বুঝ যে, স্বামী এখন হাসি-মজাকে সন্তুষ্ট হবে, তবে হাসি-মজাকের কথা বলতে দোষ নেই। আর যদি বুঝ যে, সে এখন হাসি-মজাক ভালবাসবে না, তবে এখন কিছুতেই হাসি-মজাকের কথা বলবে না। মূলকথা এই যে, স্বামীর মেজাজ বুঝে তোমার চলার দরকার।
- স্বামী যদি কোন সময় গোস্বা করে কথা না বলে, তবে তখন তুমিও মুখ ফুলিয়ে বসে থাকবে না। বরং খোশামোদ করে, কাকুতি-মিনতি করে, হাত জোড় করে, পা ধরে তোমার অপরাধ না হলেও অপরাধ স্বীকার করে অথবা স্বামীর অন্যায় হলেও তুমি তোমার নিজের অন্যায় মেনে নিয়ে মাফ চাইবে এবং যে প্রকারেই হোক না কেন, স্বামীর মন সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে।

কখনও তুমি গোস্বা করবে না, বেজার হয়ে বসে থাকবেনা। বরং মনে রাখবে স্বামীর হাত-পা ধরে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে, তাতেই প্রকৃত সুখ-শান্তি ও মর্যাদা ভাল হবে।

- স্বামীর আর্থিক সামর্থের বেশী খরচ বা কোন অতিরিক্ত জিনিসের দাবী করবে না।

- স্বামীর যেমন অবস্থা, স্বামী শাক-ভাত, মোটা কাপড় যখন যেমন যোগাতে পারে, তাতেই খুশী হয়ে হাসি মুখে, সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করবে।
- স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে না, কোন কাজ করবে না। এমনকি, স্বামী যদি দিনকে রাত, রাতকে দিন বলে, তবে তারও প্রতিবাদ করবে না।
- স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন দু'এক দিনের জন্য নয়, আজীবন স্বামীর সাথে একত্রে বসবাস করতে হবে। এরূপ অবস্থায় খোদা না করুন, যদি উভয়ের মধ্যে কিছু গরমিল এসে যায়, তবে তার চেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর জগতে কিছুই নেই। অতএব, স্ত্রীর প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, যাতে সে সর্বদা স্বামীর মন রক্ষা করে চলতে পারে। স্বামী যদি হুকুম করে যে, সারারাত্রি হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাক, তবে তৎক্ষণাত তাই করবে। মনে রাখবে-এতেই তোমার জীবনের সুখ নিহিত।
- নিজের কথার উপর কখনও জেদ করবে না। স্বামী যদি কোন কথা তোমার মতের বিরুদ্ধেও বলেন, তবুও তখন তার উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকবে। পরে হয়ত সুযোগ মত সময়ে বুঝিয়ে দিবে বা বুঝে নিবে।
- বেশি কথা বলবে না। আর এটাও করবে না যে, একবারে কথা বন্ধ করে আছ, বার বার জিজ্ঞাসা ও খোশামোদ করা সত্বেও তোমার পক্ষ থেকে কোন উত্তর নেই। এ উভয়টিই অন্যায়।
- স্বামীর বাড়ীতে গিয়ে যারা বড়, তাদেরকে সম্মান করবে এবং যারা ছোট তাদেরকে স্নেহ করবে। নিজের দায়িত্ব মনে করে কাজ-কর্ম রীতিমত করবে। নিজের কাজ কখনও অন্যের ঘাড়ে ফেলবে না। বরং অন্যের কাজও সম্ভব হলে কিছু করে দিতে চেষ্টা করবে।
- শাশুড়ী, ননদেরা বা জায়েরা যে কাজ করে, সে কাজ করতে তুমি কখনও লজ্জা বা অপমান বোধ করবে না। বরং তাদের কাজ তুমিও স্বতঃস্ফুর্তভাবে করে দিবে। এরূপ করলে, তাদের মন জয় করে নিতে পারবে।
- দু'জনকে চুপি চুপি কিছু কথাবার্তা বলতে দেখলে, তুমি সেখান থেকে সরে যাবে, পাছে কান লাগিয়ে তাদের কথা শুনবে না। অথবা এরূপ মনে কু-ধারণা আনবেনা যে, তারা বুঝি তোমার সম্পর্কে কিছু বলাবলি করছে।

একথাগুলোর উপর যে মহিলা আমল করে চলবে, স্বামীর ঘরে সে সুখ পাবে, সংসারে শান্তি পাবে পাশাপাশি মানুষের কাছে সম্মান পাবে এবং আল্লাহর ভালবাসার পাত্রী হবে।

পক্ষান্তরে নিজের অযাচিত অধিকার খাটাতে গিয়ে স্বামীর সহিত তর্কে লিপ্ত হলে, মুখের উপর কথা বললে কিংবা নিজের পজিশন রক্ষা করার নামে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলে, সে দাবী বা মর্যাদা আদায়ের মিথ্যা প্রবোধ লাভ করলেও স্বামীর সংসারে কখনও সুখ-শান্তির মুখ দেখবে না। স্বামীর নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্ তা'আলার কাছেও সে ঘৃণিতা হবে। আর সেই ঔদ্ধত্যের কাজে আশপাশের লোকদের থেকে সাময়িক কিছু বাহ্বা বা কুমন্ত্রণা পেলেও ক্রমান্বয়ে সে সকলের নিকটই অবাঞ্ছিতা ও অবজ্ঞতার দুর্ভাগা বিবেচিত হবে।

নববধুর প্রতি নছিহত -২

স্ত্রী নিজের সমস্ত প্রেম ভালবাসা উজার করে স্বামীর জন্য উৎসর্গ করবে। স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসা মাখা আচরণ করে, স্বামীর আনুগত্য করে, প্রতিটি কাজে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে, স্বামীর প্রতিটি আদেশ যথাযথভাবে পালন করে, তাহলে ঐ স্ত্রী আপন স্বামীকে দেওয়ানা বানিয়ে নিতে পারে, স্ত্রী যদি স্বামীর সেবিকা হয়ে যায়, তাহলে স্বামীও স্ত্রীর সেবক হতে বাধ্য। কিন্তু প্রথম প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ স্বীকার করে অনেক ধৈর্য্য, সহ্য এখতিয়ার করতে হবে, অনেক কষ্ট মেনে নিতে হবে, অনেক স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। আগে ত্যাগ স্বীকার করলে পরবর্তীতে অবশ্যই ভোগের পালা আসবে।

কখনও কখনও প্রাথমিক পর্যায়ে একে অপরের সাথে মেজাজের সাথে, মন মানসিকতা ও অভ্যাসের সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে ঝগড়া বিবাদ হয়ে থাকে, পরস্পরে একটু ছাড় দিয়ে একে অপরকে বুঝাতে চেষ্টা করলে তা নিরসন হয়ে যায়।

আবার কখনও কখনও এমন হয়ে থাকে যে, স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রেম ও ভালবাসার মাঝে কিছু কুটনী লোক, ফাসাদীলোক, হিংসুক লোক প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। তখন স্ত্রীকে হিকমতের সাথে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। যাতে সাপও মরে যায় লাঠিও না ভাঙ্গে।

উভয়ের নম্রতা কোমলতা পারস্পারিক সহযোগিতায় একে অপরের স্বভাব, চাওয়া-পাওয়া, মন মানসিকতা ও অভ্যাস বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে যতই কষ্ট ক্লেস সহ্য করা হোকনা কেন তাতে স্ত্রী অনেক সওয়াব পাবে। যার অনুমান এভাবে করা যায় যে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্যের পরই স্বামীর স্থান। স্বামীর সাথে নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে কথা বলবে। **আর এ বাস্তবতাটাকে নিজের অন্তরে গেঁথে**

নিবে যে, মানুষের মনকে ব্যবহার দ্বারা জয় করা যায়। স্বামীর কথা অনুযায়ী চলার দ্বারা তার প্রতি পূর্ন আনুগত্য দেখাবে। স্বামীর প্রতিটি ধিক্কার, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, ধমকি, রাগা-রাগি ইত্যাদি সহ্য করে নিবে। তা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। তার কাছে একনিষ্ঠ ভাবে প্রার্থনা করবে। শক্তি পরিমাণ দান সদকা করবে। হে আল্লাহ আমার স্বামীর চরিত্রকে সংশোধন করে দেওয়ার মালিক একমাত্র আপনি। আমাদের দু'জনের মধ্যে আপনি গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দিন। আমাদের পরস্পরের অন্তরকে মিলিয়ে দিন। আমার স্বামীর চরিত্রকে ফুলের মত সুন্দর ও নিস্পাপ বানিয়ে দিন। আমাদের পারস্পারিক বন্ধনকে সুন্দর করুন। আমাদের মাঝে ভূল বুঝাবুঝির অবসান ঘটান।

স্বামীর রাগের সময় এমন কোন কথা বলবে না, যাতে তার রাগ আরো বৃদ্ধি পায়। বরং সে সময় ভাল মন্দ কিছু বললে কোন প্রকার প্রতিউত্তর না দিয়ে নিরবে সহ্য করবে। শক্ত শক্ত কথা বললেও পরে তোমার সামনে এলে লজ্জিত হবে এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট ও খুশী হবে।

স্ত্রীদের প্রতি নছিহত-৩

তোমার সংসারের কাজ-কর্ম তোমাকেই সামলাতে হবে। যে নারী স্বামীর সংসারকে নিজের সংসার মনে না করে কাজ-কর্ম ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করে থাকে, সে নারী জীবনে কখনো সুখী হতে পারে না। সংসারের কাজ নিজের হাতে সম্পাদন করার মধ্যেই নারী জীবনের গৌরব নিহিত রয়েছে।

পৃথিবীতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় আদরের দুলালী হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে যত আদর-স্নেহ করতেন, পৃথিবীর আর কোন পিতা-মাতাই তার কন্যাকে এত আদর-স্নেহ করেনি এবং কিয়ামত পর্যন্তও করবেনা। নবীজী (সাঃ) যখন বাহিরে কোন সফরে যেতেন, সর্বশেষে হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর নিকট হতে বিদায় নিতেন এবং সফর হতে যখন ফিরতেন, সর্বপ্রথম ফাতিমা (রাঃ) এর সহিত দেখা করতেন। অথচ এত আদরের কন্যা এবং যিনি হবেন জান্নাতের সব নারীদের সর্দারিণী, তাঁর সংসারের কাজ-কর্ম সম্পর্কে একটি ঘটনা তোমাকে শুনাচ্ছি। ঘটনার বর্ণনাটি নিজের জীবনে প্রতিফলন ঘটাবার চেষ্টা করবে।

একদা হযরত আলী (রাঃ) তার জনৈক শাগরেদকে বললেন, আমি তোমাকে আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী এবং রাসূলে পাক (সাঃ) এর সবচেয়ে স্নেহের কন্যা ফাতিমার ঘটনা শুনাব কি? শাগরেদ বললেন-নিশ্চয়ই

শুনাবেন। তিনি বলতে লাগলেন-ফাতিমা (রাঃ) নিজ হাতে গম থেকে আটা পিষতেন, যার ফলে তার হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। স্বয়ংমশ্‌ক ভরে কুয়া থেকে পানি আনতেন। যার দরুন তার বুকে মশ্‌কের রশির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আবার নিজ হাতেই ঘর-দরজা ঝাড়ু দিতেন। যেই কারণে প্রায়ই তার কাপড়-চোপড় ময়লাযুক্ত থাকত।

একদিন নবীয়ে পাক (সাঃ) এর দরবারে কিছু গোলাম-বাঁদী এসেছিল। আমি ফাতিমাকে বললাম-তুমি গিয়ে রাসুলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট হতে একজন বাদী চেয়ে আন। তাহলে তোমার কাজ-কর্মে কিছুটা সাহায্য হবে। কথা মত ফাতিমা (রাঃ) হুজুর পাক (সাঃ) এর দরবারে গেলেন। তখন দরবারে যথেষ্ট লোকজন ছিল। ফাতিমা (রাঃ) অতিমাত্রায় লাজুক ছিলেন বিধায় নবী করীম (সাঃ) কে কিছু না বলে ফিরে এলেন।

পরদিন স্বয়ং নবীয়ে পাক (সাঃ) আমাদের ঘরে তাশরীফ এনে ইরশাদ করলেন, মা ফাতিমা! গতকাল কি জন্য গিয়েছিলে? ফাতিমা (রাঃ) লজ্জায় চুপ করে রইলেন। আমি আরজ করলাম-ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ) তার এই অবস্থা যে, নিজ হাতে গমের চাক্কী চালনার দরুণ হাতে দাগ পড়ে গিয়েছে। মশ্‌ক বহনের দরুণ সীনায় রশির নিশানা পড়ে গিয়েছে। তদুপরি ঘর-দুয়ার ঝাড়ু দেয়ার দরুণ প্রায়ই তার কাপড়-চোপড় ময়লাযুক্ত থাকে। তাই গতকল্য আমি বলেছিলাম-হুজুরের খিদমতে গিয়ে একজন খাদেম আনতে।

নবীজী (সাঃ) একথা শুনে বললেন-মা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। পরহেজগারী ইখতিয়ার কর। আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন কর। ঘরের কাজ-কর্ম নিজ হাতেই সম্পাদন কর।

এখন চিন্তা করে দেখেন যিনি দোজাহানের বাদশাহর কন্যা, তার সংসার জীবনের কিরূপ নমুনা! পক্ষান্তরে আজ আপনারা স্ত্রীরা একটু শিক্ষিত হলেই সংসারের কাজ-কর্ম নিজ হাতে সম্পাদন করাটাকে অপমানজনক মনে করে থাকেন। সংসার জীবনে সুখী হতে হলে, অনেক বাঁধা-বিপত্তিকে ডিঙ্গাতে হয়। নিজের মানবীয় গুণ ও কৌশল অবলম্বন করে জয় করতে হয় সকলের মন। প্রবাদ আছে সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে।

স্ত্রীদের প্রতি নছিহত-৪

স্বামীকে দিয়ে তার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে কোন কথা বলাবার কসরত কখনো খাটাবে না। এমনকি তোমার স্বামী-স্ব-ইচ্ছায় কখনো তোমার পক্ষ হয়ে তার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাইলে-এহেন ঘৃণিত কাজ

হতে তুমিই তাকে ফিরাবে। স্বামী তোমাকে যেসব জিনিষ মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে দিয়েছে, তা হয়তো সে তার পিতা-মাতা ও ভাই-বোন আর কারো পিছনে এমনটা করেনি। তুমি দুই বৎসরে যতটুকু খেয়েছ-পরেছ, তার তুলনায় স্বামীর জন্য কতটুকু কি করেছ? কিন্তু তার পিতা-মাতা এই সন্তানের নিকট হতে যা কিছু পেয়েছে বা না পেয়েছে, কিন্তু তার জন্য কত কিনা করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। জননী দশ মাস দশ দিন তাকে গর্ভে ধারণ করে অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেছে। ঠিক মত খেতে শুতে পারেনি। নিদারুণ পেটের ব্যথা সহ্য করেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিড়ম্বিত ও যন্ত্রণাদায়ক প্রসব বেদনায় কাতরিয়েছে। অতি কষ্টে, সন্তান প্রসবের পরও সন্তানকে নিয়ে তার জননী কত যে তকলীফ বরদাশ্‌ত করেছে, কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে তার কি কোন হিসাব আছে?

এরপর তাকে উপযুক্ত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে তার পিছনে কত যে কাঠখড়ি পোড়াতে হয়েছে, তা কেবলমাত্র পৃথিবীর সচেতন পিতা-মাতা ও আল্লাহ্ তা'আলা ভাল জানেন।

যাঁরা স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে পিতা-মাতার সহিত বেয়াদবী করে থাকে, তারা পিতা-মাতার সু-সন্তান নয়।

স্ত্রীদের প্রতি নছিহত-৫

স্বামী কোথাও হতে ঘরে ফিরলে, অবশ্যই তাকে সালাম দিবে। প্রয়োজনে মুসাফাহাও করবে। সফর হতে আসলে তাড়াতাড়ি বসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে। গরমের সময় হলে বাতাসের ব্যবস্থা করবে। কখন রওয়ানা দিয়েছেন, কোথায় কি খেয়েছেন, পথে কোন প্রকার অসুবিধা হয়েছে কিনা ইত্যাদি হালত জিজ্ঞাসা করবে। সেই সাথে তাৎক্ষণিক শরবত ও নাস্তার ব্যবস্থা করবে। নিজের হাতে স্বামীর গায়ের ভারী জামা-কাপড় খুলে হালকা পরিধেয় পরিয়ে দেবে।

স্বামীর অফিসে অথবা বাহিরে কোথাও যাওয়ার সময় হলে, আগে-বাগে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজ হাতে গুছিয়ে দিবে। তোমার স্বামী তোমার জন্য কাপড় চোপড় বা অন্য কোন জিনিস আনলে তোমার পছন্দ না হলেও মুখে এরূপ বলবে না যে এটা আমার পছন্দ হয়নি। অথবা বলবে না এগুলো কি মানুষে পড়ে? ইত্যাদি বরঞ্চ পছন্দ হোক বা না হোক, স্বামীর আনা জিনিসটাকে সাদরে গ্রহণ করবে এবং ঐ জিনিসের প্রশংসা করবে। আর ঐ জিনিস ব্যবহার করে স্বামীর মনে আনন্দ জোগাবে।

তোমার কোন জিনিস পরার অথবা খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে যদি দেখ যে, এই জিনিস আনার মত স্বামীর আর্থিক সামর্থ নেই, তাহলে তার নিকট কখনও এর আবদার করবেনা। স্বামীর সাথে কোন বিষয় নিয়ে জিদ ধরবেনা।

দেখ কখনো জিদের বশবর্তী হয়ে একরোখা কথা বল না। যদি কোন কথা তোমার মর্জিমত না হয়, তবে সময়মত সঙ্গত উপায়ে পরে বুঝিয়ে বলবে। স্বামীর বাড়িতে কষ্ট-ক্লেশে ভুগলে মুখে কখনো তার সামনে কোন কিছু এ সম্পর্কে উচ্চারণ করবে না, যে অবস্থায়ই থাক সর্বদা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত মানসিকতার পরিচয় দিবে, যাতে সে কষ্ট না পায়। এমন উদার ও সংবেদনশীল মনের পরিচয় দিলে তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে স্বামীর অন্তর।

স্বামী তার সামর্থ অনুযায়ী যা খাওয়ায় পরায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা স্ত্রীর পক্ষে অতি বড় ইবাদত এবং তাকে অসন্তুষ্টি করা বা নারাজ রাখা বড় গুনাহ। মোট কথা, সকল দিক লক্ষ্য রেখে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দিবে। তবেই স্বামী হবে তোমার কজিবন্দী। আর সংসারে নেমে আসবে বেহেশ্‌তী সুখ ও অনাবিল শান্তি।

স্ত্রীদের প্রতি নছিহত-৬

স্বামীর পর যাদের মন তোমাকে জয় করতে হবে, তারা হলেন তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী। একটা মেয়ে যখন স্ত্রী রূপে স্বামীর ঘরে পা রাখে, প্রথমেই তাকে যে বিষয়টির দিকে নজর দিতে হবে, তা হল স্বামীর পরিবারের কার মেজাজ কোন ধরনের। স্বামীর পিতা-মাতা কোন ধরনের চলাফেরা পছন্দ করেন এবং বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে শ্বশুর-শাশুড়ী তার নিকট হতে কোন ধরনের খিদমত আশা করেন। সংসারের কোন অভিযোগের কথা স্বামীকে শুনাবে না। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী ও ননদেরা তোমাকে অন্যায়ভাবে কিছু বললেও স্বামীর নিকট তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা নালিশ করবেনা। মনে রাখবে-এদের সাথে তোমার স্বামীর রক্তের সম্পর্ক। আর তোমার সাথে কেবলমাত্র প্রণয়ের সম্পর্ক। তাই অনবরত নালিশ অভিযোগের কারণে তোমার প্রতি বিগড়াতে বা বীতশ্রদ্ধ হতে সময় লাগবে না। এজন্য কর্তব্য হল-এ সকল পারিবারিক সমস্যা দূর করবে কৌশল আর নিজের গুণ দিয়ে।

স্বামী তার পিতা মাতার হাতে টাকা পয়সা অথবা অন্য কোন কিছু দিলে তাতে অসন্তুষ্ট হবে না। বরঞ্চ এতে স্বামীকে উৎসাহ প্রদান করবে

এবং স্বামী কোন ফল-মূল বা মিষ্টিদ্রব্য আনলে শ্বশুর-শাশুড়ীর হাতেই তুলে দিবে। পিতা-মাতার বাড়ি থেকে যা কিছু আসে তা শাশুড়ী ননদের নিকট পাঠিয়ে দিবে অতঃপর তারা যা করে তাতেই সন্তুষ্ট হবে। সম্ভব হলে স্বামী কর্তৃক দেয়া কোন জিনিস নিজে গ্রহণ না করে শাশুড়ীর মারফতে বা শ্বশুরের মারফতে গ্রহণ করা উচিত।

শ্বশুর-শাশুড়ীকেই তোমার আপন পিতা-মাতার মতই তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি করতে হবে। আপন পিতা-মাতার হুকুমের মত তাদের হুকুম বা আদেশ নিষেধকে শিরোধার্য করতে হবে। কোন দিক দিয়েই আপন পিতা-মাতার থেকে শ্বশুর-শাশুড়ীকে খাটো চোখে দেখবে না। শ্বশুর-শাশুড়ী ও ননদদের সাথে আদবের সাথে কথা বলতে হবে। কর্কষ ভাষায় কথা বলবে না। **কারণ একদিন আপনিও শাশুড়ী হবেন। তখন আপনার সঙ্গেও তাই করা হবে।** সুতরাং অতি আদবের সহিত তাদের সাথে কথা বলবে। তোমাকে তারা অন্যায় ভাবে কিছু বললেও তাদের কথার প্রতিউত্তর করবে না। প্রয়োজনে তোমার সহিত তারা যত খারাপ ব্যবহার করবে, তুমি তত বেশী তাদের খেদমতে লেগে যাবে। তাহলে একদিন দেখবে-তাদের ভুল তারা বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে তোমার বশে এসে গিয়েছেন।

কোথাও যেতে হলে অথবা সংসারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পূর্বে স্বামীর অনুমতিকেই যথেষ্ট মনে করবে না, বরং শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতিকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে। নামাযের সময় হলে নিজ হাতে তাদের উজুর পানি এনে দিবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর কাপড়-চোপর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। সংসারে অন্যরা শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য কি করলো না করলো তা নিয়ে বাদানুবাদ করবেনা। তোমার কর্তব্য তুমি পালন করবে। শাশুড়ীর কাজ তাদের বলা ছাড়া তুমি নিজেই তা করে ফেলবে এতে তাদের মনে তোমার প্রতি ভালবাসা জন্ম নিবে।

শ্বশুর-শাশুড়ী যত দিন জীবিত থাকেন, তাদের আনুগত্য ও খেদমত করা কর্তব্য। এতে নিজের মর্যাদা জ্ঞান কর। শাশুড়ী ও ননদদের থেকে ভিন্ন হওয়ার চিন্তা কখনই করবে না। কারণ এখান থেকেই পরস্পরের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। শ্বশুর-শাশুড়ী ছেলেকে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় বানিয়েছে কেন? ছেলে বড় হলে তারা শান্তিতে থাকতে পারবে এজন্যইতো। বিবাহ করিয়ে দেয়ার পর যদি তাদের দিকে মোটেও না তাকিয়ে দু'একদিনের মধ্যেই আলাদা হওয়ার চিন্তা কর, তখন মাতা-পিতাই বলবে-ছেলে বুঝি আমাদের ছেড়ে আলাদা হয়ে যাবে। যা জানতে পারার পর থেকে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে।

সংসারের কোন কাজ শাশুড়ী করবে বলে ফেলে রাখবেনা। সকল কাজ নিজ হাতে করার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। বরং শাশুড়ী কোন কাজ করতে গেলেও তার হাত হতে সেই কাজ তুমি কেড়ে নিবে। এর দ্বারা তোমার সমাদর বাড়বে।

সংসারের কাজ এলোমেলো করে ফেলে রাখবেনা। সকল কাজ সব সময় সাজিয়ে গুছিয়ে করবে। ঘর-দরজা সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে শ্বশুর-শাশুড়ীর খোঁজ খবর নিবে। তাদের ঘর তুমি নিজেই ঝাড়ু দিবে। যদি শাশুড়ী পান খেতে অভ্যস্থ হন তাহলে পানের বাটায় পান মসল্লা প্রস্তুত করে রাখলে সহজে মন পাওয়া যাবে। মায়ের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করে থাকো শাশুড়ীর সাথে তাই করবে।

তোমার স্বামী তোমাকে শহরে তার নিকট নিতে চাইলেই খুশী হয়ে চলে যাবে না। বরং এ কথা বলবে এবং বুঝাবে যে, এ অবস্থায় আব্বা-আম্মাকে ফেলে আমি শহরে যাব না। দেখবে-তোমার মুখের এই কথা শুনে তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী তাদের ছেলের থেকেও তোমাকে অধিক মহব্বত করতে শুরু করবে। এরপর যদিও বাধ্য হয়ে তোমার স্বামী তার পিতা-মাতার খিদমতের লোক রেখে তোমাকে শহরে নিয়ে যায়, তাতে তোমার দোষ হবে না।

শ্বশুর-শাশুড়ীর শরীর অসুস্থ রেখে পিতার বাড়িতে যাবে না। যদিও পিতা বা ভাই তোমাকে আনতে যায়। এতেও তোমার যথেষ্ট সমাদর বাড়বে।

ননদেরা স্বামীর বাড়ি হতে বেড়াতে আসলে ছুটে তাদের নিকট গিয়ে কুশলাদি বিনিময় করবে। তাদের আসাকে অত্যধিক আনন্দের ব্যাপার মনে করবে। তবে শরয়ী পর্দার যেন ব্যাঘাত না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কখনো ননদদের সামনে মুখ ভার করে চলবেনা। তাদের দিয়ে কোন কাজও করাবে না। খাওয়া-দাওয়া তাদের সাথে একসঙ্গে করবে। গোসলের সময় নিজের তেল-সাবান বের করে দিবে। তাদের আসার কারণে কোন কিছু লুকিয়ে রাখবেনা। তাদের ছোট্ট ছেলে-মেয়েদেরকে অত্যাধিক আদর স্নেহ করবে।

সংসারের আপনজন যারা, তাদের কথা মেনে চলবে, সব সময় তাদেরকে বড় বোনের মত জানবে। কোন কাজ বা খাওয়া-পড়া নিয়ে কোন বাদা-বাদী করবে না। তারা তোমার সহিত খারাপ ব্যবহার করলেও তুমি সব সময়

তাদের সহিত ভাল ব্যবহার করবে। কোন বিষয় নিয়ে রেষা-রেষি করে তাদের সহিত কথা বন্ধ করে দিবে না।

প্রতিবেশীর মহিলারা বেড়াতে আসলে বসতে দিবে। পান অথবা পারলে হালকা নাস্তা ও খেতে দিবে। আর অযথা গল্প-গুজব না করে তাদের সাথে দ্বীনের কথা বার্তা বলবে। কোন কিছু কর্জের জন্যে আসলে শ্বশুর-শাশুড়ীও স্বামীর অনুমতি নিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।

শ্বশুর বাড়ির সমালোচনা কখনো পিত্রালয়ে গিয়ে করবে না এবং সেখান থেকে এ ব্যাপারে পত্র ও লিখবেনা। অনুরূপ শ্বশুরালয়ে এসে পিত্রালয়ের প্রশংসা ও বড়ত্ব প্রকাশ করতে চেষ্টা করবে না।

এভাবে দাম্পত্য জীবনে পথ চলতে পারলে অবশ্যই তুমি সংসার জীবনে সুখী হবে এবং পরকালেও এর উত্তম বিনিময় আল্লাহ্ পাক দান করবেন।

বউদের প্রতি নছিহত-৭

বউয়ের কর্তব্য হচ্ছে-স্বামীর পরিবার বিশেষতঃ শাশুড়ীকে শালীন, ভদ্রতাসুলভ ও মার্জিত ব্যবহার উপহার দেয়া, স্বামীর ঘর-সংসারে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম পূর্ণ দায়িত্ব ও সচেতনতার সাথে আঞ্জাম দেয়া, শাশুড়ীর দিক-নির্দেশনা মতে চলা, তার নেতৃত্ব মেনে চলা এবং শ্বশুর-শাশুড়ীকে বাবা-মায়ের মর্যাদা দেয়া। মূলতঃ মেয়েদের এ নতুন জীবনকে সুন্দর ও মধুময় করতে হলে স্বামীর পরিবারের সব সদস্যের সাথে ভালবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচার-ব্যবহার ও চলাফেরার কোন বিকল্প নেই।

বউয়ের উচিত এমন কাজ, কথা ও আচার-আচরণ পরিহার করা, যার কারণে শাশুড়ীর অন্তরে ব্যথা আসে। শাশুড়ী হল মায়ের সমতুল্য। তাকে মায়ের মত সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। মায়ের অবর্তমানে শাশুড়ীর কথা মতোই চলতে হবে। বস্তুতঃ সংসারের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সঠিকভাবে আঞ্জাম দিলে এবং শাশুড়ীর যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করলে, শাশুড়ীর কোন কটু কথা বলার প্রশ্নই উঠে না। তখন শাশুড়ী এমনিতেই বউকে আদর-সোহাগ করতে বাধ্য হবে।

বউ তার নিজের মা-বাপ ও ভাই বোনদের নিকট কখনও স্বামী ও শাশুড়ীর বা সেই বাড়ির কোন বদনাম করবে না। গুণের সাথে দোষ-ক্রটি ও মানুষের মাঝে বিদ্যমান থাকে। এ হিসাবে শাশুড়ী থেকেও অনাকাংখিত

কোন কিছু ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এক্ষেত্রে সবর ইখতিয়ার করতে হবে। আর খবরদার, স্বামীকে তার মা-বোনদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে না। বরং ধৈর্য্য-সহ্যের সাথে শাশুড়ীর মন জয় করার জন্য সচেষ্ট হবে। তাতে অবশ্যই ফল পাবে। ইহকালে না পেলেও পরকালে তার উত্তম জাযা লাভ করা অবশ্যম্ভাবী।

বউদের প্রতি নছিহত-৮

ইসলামের দৃষ্টিতে বউয়ের কর্তব্য হল শাশুড়ীর সহিত সদ্ব্যবহার করা, তাঁর খিদমত করা এবং যৌথ পরিবার হলে, তাঁর নির্দেশনামত সংসার পরিচালনা করা। শাশুড়ীকে প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করে তার সাথে আড়াআড়ির আচরণ করা বধুর জন্য কখনও উচিত নয়।

অনেক পুত্রবধূ অত্যন্ত হিংসুক ও ঝগড়াটে হয়ে থাকে। যদ্দরুণ শাশুড়ীকে দুঃখ কষ্ট ও জ্বালাতন সহ্য করতে হয়। বিশেষ করে যখন শাশুড়ী বেচারী পুত্র ও পুত্রবধূর মুখাপেক্ষী হন, তখন অনেক বধু বে-লাগাম ও বে-পরওয়া হয়ে যায়। তারা শাশুড়ীকে কথায় কথায় খোঁটা দেয় এবং বিভিন্ন পন্থায় জ্বালাতন করে।

কোন কোন বউয়ের মধ্যে এ বদঅভ্যাস পরিলক্ষিত হয় যে, সে সাংসারিক ব্যাপারে সামান্য সামান্য কথাকে বাড়িয়ে তিলকে তাল করে সাজিয়ে স্বামীর নিকট শাশুড়ী ও ননদের বিরুদ্ধে নালিশ করে থাকে। ইনিয়ে বিনিয়ে মায়া কান্না কেঁদে শাশুড়ী ও ননদের বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তেজিত করতে থাকে। স্বামী বেচারা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকেন বিধায় চালবাজ স্ত্রীর প্রতারণার শিকার হন। যদ্দরুণ স্বীয় মা-বোনদের সাথে ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি মা ও ভাই-বোনদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। স্মরণরাখতে হবে, এমন বউ-যারা শাশুড়ীদের উপর জুলুম করে, তারা এ পৃথিবীতেই তার শাস্তি ভোগ করবে, তারা জীবনে কখনও শান্তির মুখ দেখতে পারবে না।

বউমাকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, স্বামীর সেবা-যত্ন করা মহান আল্লাহ্তা'আলা তার উপর ফরজ করেছেন। ইনসাফের দৃষ্টিতে পুত্রের জন্য মায়ের চেয়ে পৃথিবীতে অন্য কেউ সম্মানিত নয়। মা-জননী অসংখ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তাকে লালন-পালন করেছেন। এখন সেই আদরের পুত্র বউমার স্বামী। তার স্বামীর জান্নাত যার পদতলে, তিনি হলেন তাঁর সেই বৃদ্ধা মা। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।"

সুতরাং বউয়ের লক্ষ্য রাখা দরকার যে, তার স্বামীর জান্নাত যেই মায়ের পায়ের নীচে, সেই মায়ের মনে কষ্ট দেয়ার কারণে স্বামীর জান্নাত যাতে নষ্ট না হয়ে যায়।

বরং গৃহবধূ যদি নিজ স্বামীর খিদমতের পাশাপাশি শাশুড়ীর খিদমত করতে পারে, তাহলে এটা তার খোশ কিসমত। কারণ এর দ্বারা মা স্বীয় ছেলে ও বধুর উপর সন্তুষ্ট থাকবেন-যা তাদের ইহ ও পরকালে সাফল্য লাভের সহায়ক হবে।

নববধূকে স্মরণ রাখতে হবে যে, শাশুড়ী নিজ গৃহের কর্তী ও রাণী। তিনি মজ্জাগতভাবে এটাই কামনা করেন যে, সংসারের ছোট-বড় সকলেই তার কথা মত চলুক, তার আদেশ পালন করুক, তার সম্মান রক্ষা করুক, সবাই সকল কাজ তার পরামর্শ অনুযায়ী করুক। বউ কথা মানবে না, এটা কোন শাশুড়ীই বরদাশ্‌ত করবেন না। তেমনিভাবে বউয়ের দুর্ব্যবহার, কর্কষ ভাষা, বদমেজাজ ও বাচালিপনা শাশুড়ীদের সহ্য হয় না। তাই নববধূর জন্য আবশ্যক যে, সর্বাবস্থায় শাশুড়ীর মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা, তার আদব-লেহাজ বজায় রাখা।

সর্বস্তরের বউদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করছিঃ আপনার শাশুড়ী অর্থাৎ আপনার স্বামীর গর্ভধারিণী মাতা তো আপনার মতোই একদিন বউ হয়ে এ বাড়িতে আগমণ করেছিলেন্ আর আপনিওতো ক'দিন বাদে তার মতোই শাশুড়ী হবেন ইনশাআল্লাহ। এখন আপনার নতুন জীবনে পথ চলার দিশা পেতে তার কাছ থেকে শিক্ষা নিবেন।

উগ্র স্বভাব বউদের একটি নিকৃষ্ট নিন্দনীয় স্বভাব। বউয়ের মধ্যে এ নিকৃষ্ট স্বভাব থাকলে, তাকে কেন্দ্র করে সেই সংসারে নির্ঘাত সংঘাত নেমে আসবে। অতএব, বউদের উগ্র স্বভাব ত্যাগ করে শালীনতা, বিনয় ও নম্রতা গ্রহণ করতে হবে।

বউদের প্রতি নছিহত-৯

কোন্ বিবেচনায় আর কোন্ যুক্তিতে আপনি শাশুড়ীকে এড়িয়ে যাবেন এবং অবহেলা করবেন-যার গর্ভজাত সন্তান আপনার জীবন সংগী? সেই গর্ভধারিণী বেচারীর মর্যাদা কম কিসে? স্বামীকে আপন করে নিবেন, আর শাশুড়ীকে দূরে ঠেলে দিবেন, এটা তো যুক্তি সংগত নয়।

আর আপনিও তো মা হবেন, তখন ঠিকই বুঝতে পারবেন। আপনার ছেলেকেও তো বড় করে গড়ে তুলে কোথাও বিবাহ দিবেন এবং বধূ ঘরে আনবেন। সেই বধূ আপনাকে এড়িয়ে অবহেলায় রেখে আপনার ছেলেকে

হাতের মুঠোয় করে নিবে-তা কি আপনি মেনে নিবেন? এ ক্ষেত্রে আপনি যা চাবেন, এখন আপনার শাশুড়ী তো তা ই-চাচ্ছেন। তাই তার আবদার কেন মেনে নিবেন না?

অবশ্য বাস্তবে দেখা যায়-কিছু সংখ্যক শাশুড়ীদের স্বভাবে ও আচরণে ভুল-ত্রুটি বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে শাশুড়ীরা না বুঝে, আবার কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে বসেন। এগুলো হয়তো তাদের জন্মগত স্বভাব। বউয়েরা যতটা সম্ভব এসব ভুলগুলো মেনে নিয়ে স্ব স্ব শাশুড়ীদের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়তে সচেষ্ট হবেন। মনে রাখবেন, আপনার প্রতি যদি আপনার শাশুড়ী অন্যায় আচরণ করেন এবং আপনি তা নীরবে সহ্য করেন, তবে আশা করা যায়-পরকালে এর বিনিময়ে আপনি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেন।

সংসারিক সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধিতে একজন বউয়ের ভূমিকা অপরিসীম। একজন বউয়ের ভূমিকার কারণে সংসার হতে পারে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। তাই স্বামীর মত স্বামীর সংসারের অন্যান্য সদস্য বিশেষ করে জননীতুল্য শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ী, ভগ্নিতুল্য ননদ, বড়বোনতুল্য জেঠানী, ভ্রাতাতুল্য দেবর ও পিতাতুল্য শ্বশুরের মন জুড়িয়ে সংসার ধর্ম পালন করা প্রতিটি বউমার কর্তব্য।

অনেক সংসারে দেখা যায় আরামপ্রিয় বউ সংসারের কর্মকে বিলাসী জিন্দেগীর পথে বাঁধা ভেবে সংসারের কাজে হাতই দিতে চায় না। শাশুড়ী বেচারী সংসারের কাজ করে হয়রান, অথচ সহমর্মিতাহীনা পুত্রবধূর সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই, সে কেবল রূপচর্চা, আড্ডা আর আমোদ প্রমোদে মেতে সময় কাটায়।

জনৈক যুবক পুত্র একটা ব্যাপারে বয়োবৃদ্ধ পিতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া লাঠি উচাইয়া পিতাকে ধাওয়া করিতে করিতে বাড়ির অনতি দূরে বটগাছ পর্যন্ত পৌছাইলে বাবা গাছতলে ধড়াস করিয়া বসিয়া পড়িল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুত্রের সমীপে করজোড়ে কাতর কণ্ঠে বলিলঃ "বাবা, সমানে সমান। আর ধাওয়া করিস না। আমিও এককালে তোর দাদাকে এই বটবৃক্ষ পর্যন্তই ধাওয়া করিয়াছিলাম।"

এই হইল আল্লাহর প্রতিশোধ। আজকের পুত্রবধু কালকে শাশুড়ী হইবে। সুতরাং শাশুড়ীর সঙ্গে আচরণকালে পুত্রবধুদের এই উপমাটি সর্বদা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।

বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীকে অধিকাংশ বউরা-ই সংসারে একটা আপদ মনে করে। কেউ কেউ স্বামীকে কুপরামর্শ দিয়ে বলে-তোমার অন্য ভাইয়েরা খেতে দিতে পারে না? তুমি একা দিবে কেন?

ভেবে দেখার বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত বউদের মন-মানসিকতা কতটা নীচে নেমে গেছে। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের পিতা-মাতা ও সন্তানের মত দেখতে হবে। এটাই হচ্ছে ইসলামের হুকুম।

কোন ভুল ত্রুটি শুধরাতে শাশুড়ী যদি কিছু বলেন, তাতে বউয়ের অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। বরং বউয়ের একথা খেয়াল করা উচিত যে, আমি যখন বাপের বাড়িতে ছিলাম তখন আমার মা আমাকে কত বকাঝকা দিয়েছেন, অন্যায়ের জন্য রাগ করেছেন, তখন তো আমি সব সহ্য করেছি। এখন শাশুড়ী না হয় রাগের মুখে কিছু বললেনই তাতে কি হয়েছে। আমি সবর করব। আর নামাজ পড়ে শাশুড়ীর রাগ ও দিলের ব্যথা আল্লাহ্পাক যাতে দূর করে দেন- এজন্য দু'আ করব।

বউদের প্রতি নছিহত-১০

স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক গভীরতর করা যেমনিভাবে বধূর কর্তব্য, তেমনিভাবে স্বামীর স্নেহময়ী মা-জননীর অর্থাৎ শাশুড়ীর সাথেও সুসম্পর্ক গভীর করা তার কর্তব্য। শাশুড়ীরা স্বীয় বউ হতে খিদমত কামনা করেন।মায়ের খিদমত করার দায়িত্ব সন্তানের। স্বামীর বিভিন্ন প্রয়োজনে বাহিরে অবস্থান কালে তার মায়ের সেবার দায়িত্বটুকু স্বাভাবিকভাবেই তার স্ত্রীর উপরই বর্তায়। অধিকন্তু শাশুড়ী বয়োবৃদ্ধ হয়ে অকর্ম বা দীর্ঘ অসুস্থতায় ভুগলে সার্বক্ষণিক একজন সহযোগীর সেবা পেতে চান। কিন্তু আজকাল প্রায় বধূরা শাশুড়ীকে সেবা করার মানসিকতা তো রাখেই না, বরং অনেকে মাজুর শাশুড়ীকে রীতিমত ঘৃণা করে। অথচ এ সকল বউদের চিন্তা করার প্রয়োজন যে, তারাও একদিন শাশুড়ী হবে এবং তারাও তাদের বউদের থেকে এভাবেই খিদমত পেতে মুখাপেক্ষী হবে।

নিজের অবুঝ সন্তান যেমনি সার্বক্ষণিক মান-অভিমানে অথবা আবদারে বিরক্ত করে তোলে,বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীও তদ্রুপ। মানুষ বৃদ্ধাবস্থায় পৌছলে অবুজ শিশুসুলভ আচরণ করা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের পিতা-মাতার আসনে গণ্য করলে কোন সমস্যাই থাকেনা।

তাই শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজ পিতা-মাতার ন্যায় যথাসাধ্য ধৈর্য্য ও সম্মানের সাথে খিদমত করে নিজ জীবনকে ধন্য করার সাথে সাথে দু'জাহানের কামিয়াবী হাসিল করা প্রত্যেক বউয়ের উচিত। মনে রাখতে হবে-আজকের বধু আগামী দিনের শাশুড়ী। আন্তরিকতার সাথে শাশুড়ীর খিদমত করতে পারলে, 'যেমন কর্ম তেমন ফল' হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন ধারায় নিজেও একদিন বউয়ের সেবা পাবেন নিঃসন্দেহে।

বউকে সচেতন হতে হবে এবং নিজের সুখের ঘর নিজ গুণের দ্বারা রচনা করতে হবে। কারো কুপ্ররোচনায় কান দেয়া যাবে না। নিজের সংসার ভাঙ্গলে কুটনী প্ররোচিকারা কিন্তু জুড়ে দিবে না।

বউয়ের আত্মম্ভরিতা, মন-মতলবী, অহমিকা ও বদচলন অনেক সময় ঝগড়ার কারণ হয় এবং বউ-শাশুড়ীর দ্বন্দ্ব ঘটায়।

কিন্তু বউ যদি সামান্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সহিত চলে এবং সেসব বদস্বভাব পরিহার করে বড়ত্ব, অহংকার ও নাদানী পরিত্যাগ করে আপন মর্যাদার স্তর চিনে সহনশীলতার জিন্দেগী গঠন করতে পারে, তাহলেই ঘর ও সংসারে শান্তি নেমে আসবে এবং পরিবার হবে সুখ-শান্তির উদ্যান।

শাশুড়ীদের প্রতি নছিহত-১

বিয়ের মাধ্যমে যখন একটি দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়, স্বামী ও তার পরিবার নববধূকে বরন করে নিয়ে যায়, আর বধু তার সকল আত্মীয় স্বজন, মা-বাবা, ভাই-বোন ও বান্ধবী মহল ছেড়ে পাড়ি জমায় স্বামীর গৃহে, তখন স্বামীর পরিবারবর্গ নববধূকে আন্তরিকতার সাথে বরণ করে নেয়া, আর বধূ স্বামীর পরিবারে নিজেকে ফিট করে নেয়াই যুক্তিযুক্ত ও করণীয়।

এক্ষেত্রে শাশুড়ীর কর্তব্য হল-পুত্রবধূকে আপন মেয়ের মত মায়া-সোহাগ দিয়ে তার হৃদয় প্রশান্ত রাখা। কারণ, বউ তার মা-বাবা, ভাই-বোন ও পাড়া-পড়শী সকলকে ত্যাগ করে, সকলের মায়া-মমতাকে বিসর্জন দিয়ে স্বামীর গৃহে এসেছে। স্বজনদের বিরহ বেদনায় সে থাকে জর্জরিত। তখন শাশুড়ী ও স্বামীর নিকট তার হৃদয়ের একান্ত প্রত্যাশা থাকে সোহাগ ও ভালবাসা। এভাবেই বউ স্বপ্ন দেখে সুন্দর আগামীর, স্বপ্ন আঁকে সফল ভবিষ্যতের।

আবার এ নব অতিথি বউকে আপন করে নেয়া এবং তার সাথে সন্তানতুল্য হৃদ্যতাপূর্ণ আচরন করা শাশুড়ীর কর্তব্য। পাশাপাশি ঘরের অন্যান্য সকলেও যাতে নববধুর সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তার প্রতিও শাশুড়ীকে দৃষ্টি দিতে হয়।

শাশুড়ীর মনে রাখতে হবে পুত্রবধূ ক্রয় করা দাসী নয়। যেমনিভাবে শাশুড়ীর নিজের সুখ-দুঃখ, আরাম-আয়েশের অনুভূতি রয়েছে, তেমনিভাবে এ বউমারও অনুভূতি রয়েছে। যখন শাশুড়ী কোন এক কালে বউ ছিলেন। তখন তিনি শাশুড়ীর পক্ষ থেকে যেমন আচরণ-ব্যবহার

কামনা করতেন, তেমনি সুব্যবহার আজকের এ বউও শাশুড়ী থেকে কামনা করে। শাশুড়ী স্বীয় জিন্দেগীর সকল রঙ্গীন স্বপ্ন, সুখ, কামনা-বাসনা পূর্ণ করেছে। এখন বউয়ের স্বপ্ন সুখ, আরাম-আয়েশ ও আকাঙ্খা পূর্ণ করার পালা। শাশুড়ীকে এ সত্যটি মানতেই হবে।

শাশুড়ীদের প্রতি নছিহত-২

একজন শাশুড়ী যেখানে তার বউকে স্নেহ-মমতায় রাখতে পারে এবং তার ভুল-ক্রটিগুলো আদরের সাথে শুধরে দিতে পারে, সেখানে পান থেকে চুন খসলেই বউকে নানা রকম কটুবাক্য ও গালমন্দ শুরু করে দেয়। কোন সময় সামান্য ভুলের কারণে বউকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত করে বা ছেলেকে বউয়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে এটা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। মানুষের ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ ভুল শোধরানোর উত্তম ব্যবস্থা অবশ্যই আছে। তা না করে বউকে অপমান করা লাঞ্ছিত করা এবং ছেলেকে ক্ষেপিয়ে পরিবারকে উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্তি পূর্ণ করার কোন অর্থ হয় না।

শাশুড়ীকে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারীণী হয়ে পুত্রবধূর ভুল-ক্রটিসমূহকে ক্ষমা,সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এ ভুল-ক্রটি বউমা স্বেচ্ছায় করে না। বরং সংসার পরিচালনায় অনভিজ্ঞতা প্রসূত হয়ে থাকে। কেননা, সে রান্না-বান্না, ঘর গোছানো, ঘর, সাজানো, অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে আচার-আচরণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা-ই স্বাভাবিক। কারণ, এর আগে সে এভাবে সংসার করে আসেনি। এ সংসার ধর্ম তার কাছে নতুন। তাই এতে তার কিছু ভুল ক্রটি হওয়া স্বাভাবিক। এ ভুল, অপরাধ ও অন্যায়সমূহ শাশুড়ী আম্মাও হয়ত কোন যামানায় করেছেন এবং সেটা তার শাশুড়ীকে মেনে নিতে হয়েছে। তাই শাশুড়ী আম্মার কর্তব্য হল-পুত্রবধূর সাথে স্নেহের কন্যা সুলভ আচরণ করবেন। তার ভুল-ক্রটিসমূহ প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে ক্ষমা করে দিবেন। বউ যদি অজ্ঞতা বশতঃ এমন মারাত্মক ভুল করেই বসে যা ক্ষতিকারক, তাহলে তা নম্রতার সাথে সুন্দর পদ্ধতিতে বুঝিয়ে দেয়া এবং তার সংশোধন করে দেয়া কর্তব্য। আর সামান্য ও ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাকে তিরস্কার না করা উচিত।

অনেক সহমর্মিতাহীনা শাশুড়ী পুত্রবধূর কাঁধে সংসারের এমন সব কাজকর্ম চাপিয়ে দেয় যা মূলতঃ পুত্রবধূর দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং যা তার জন্য দুরূহ বোঝা স্বরূপ। উহা শাশুড়ীদের অনুচিত।

শাশুড়ীদের প্রতি নছিহত-৩

"উগ্র স্বভাব" শাশুড়ীদের একটি নিকৃষ্ট নিন্দনীয় স্বভাব। শাশুড়ীর মধ্যে এ নিকৃষ্ট স্বভাব থাকলে তাকে কেন্দ্র করে সেই সংসারে নির্ঘাত সংঘাত নেমে আসবে। অতএব, শাশুড়ীদের উগ্র স্বভাব ত্যাগ করে শালীনতা, বিনয় ও নম্রতা গ্রহণ করতে হবে।

আবার অনেক শাশুড়ীরা আলবউদের সাথে ঠিক দাসীর অনুরূপ আচরণ করে থাকে ফলে সরলা-অবলা পল্লীবধূগণ মুখবুজে সয়ে যান শাশুড়ীদের অত্যাচার। গুমরে গুমরে চুপে চুপে কাঁদতে থাকেন তারা। আকাশ-বাতাসের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়, তাদের কান্না। এমন করা শাশুড়ীদের উচিত নয়।

আবার কখনও বউ যখন নিজের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ অথবা প্রসাধনী-সামগ্রী ক্রয় করে, তখন শাশুড়ীর মনে সংশয় বাসা বাধে যে, আমার ছেলের পকেট খালি করে দিচ্ছে কিনা। এছাড়াও বউ কোন কিছু ক্রয় করলেই আড়ির বশে শাশুড়ীর মুখটা মলিন হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে শাশুড়ীর মনে রাখতে হবে-তিনি যখন বধু ছিলেন, তখন এমন প্রসাধনী ব্যবহার করেছেন। আর স্বামীর কর্তব্যও হচ্ছে-স্ত্রীর প্রয়োজনীয় প্রসাধনীর যোগান দেয়া, এটা স্ত্রীর হক। তাই বউয়ের জন্য এসব পাওয়ার ন্যায্য অধিকারকে অনুধাবন করে তা মেনে নিতে হবে এবং মনকে প্রশস্ত করতে হবে।

একশ্রেণীর অত্যন্ত নীচুমনা যৌতুকবাজ শাশুড়ী সমাজে রহিয়াছেন, যাহারা ছেলেকে বিবাহ করাইয়া-ই ভাবিতে আরম্ভ করেন যে, পেটবাবার মাজার শরীফ উদ্বোধন করিয়া মাত্র দানবাক্স বসাইলাম। তারপর শুকুনের মত অপেক্ষা শুরু, ছেলের শশুরবাড়ি হইতে কখন কোন উপলক্ষে কী কী হাদিয়া , তোহফা, উপহার, উপঢৌকন আসে। ইহা মারাত্মক অন্যায় কাজ।

একই সংসারে একাধিক বউয়ের অবস্থান হলে শাশুড়ীর জন্য সকলকে এক চোখে দেখা আবশ্যক। অন্তরের টান কারো জন্য বেশী থাকতে পারে, কিন্তু বাহ্যিকভাবে সকলের সাথে এক নীতি অবলম্বন করতে হবে। কোন একজনকে প্রধান্য দিয়ে অন্যদেরকে, অবজ্ঞা করা জায়িয নয়। বরং যদি একজনকে প্রধান্য দেয়া হয়, তাহলে বাকীরা স্বাভাবিকভাবেই বিগড়ে যাবে। ফলে নানা দ্বন্দ্ব দেখা দিবে।

শাশুড়ীর প্রতি নছিহত-৪

আদর-সোহাগের সাথে হাসি মুখে বউয়ের সাথে কথা বলুন। তার ছোট খাট ভুল-ত্রুটিগুলো এড়িয়ে চলুন। মারাত্মক ভুলগুলো স্নেহ-মমতা দিয়ে শোধরাতে আন্তরিক হোন। দেখবেন-আস্তে আস্তে মেজাজী বউ আপনার পোষ মেনে যাবে। পক্ষান্তরে কড়া-কর্কশ আচরণ করলে, বউ বিগড়ে গিয়ে অযাচিত আচরণই করতে থাকবে। এমনকি তা তুমুল ঝগড়া-বিবাদ থেকে শুরু করে মারামারি ও ছাড়াছাড়ি পর্যন্তও গড়াতে পারে।

শাশুড়ী ৪০-৫০ বৎসর যাবত সংসার করে আসছেন। শাশুড়ীর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, বউয়ের সেটা নেই। এক্ষেত্রে শাশুড়ীর এ কথা চিন্তা করা উচিত যে, আমি যখন এই বাড়ীতে বধূ হয়ে এসেছি তখন তো আমি কত ভুল করেছি। বউ এখন নতুন, তার একটু আধটু ভুল হওয়াই স্বাভাবিক।

বউ নির্বাচনে যদি আপনি ভুল না করে থাকেন, তবে তো বউয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক মধুর থাকারই কথা। তাই যারা এখনও শাশুড়ী হননি, তাদের খিদমতে আরজ-আপনার পুত্রের বউ নির্বাচনে শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহ যথাযথ অনুসরণ করতে ভুলবেন না। অন্যথায় শাশুড়ী হিসেবে আপনি আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে হয়তো পারবেন না। আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারায় লালিত-পালিত একজন বউয়ের কাছে শাশুড়ী বেচারী অবহেলিতা হবে এটাই তো স্বাভাবিক। লবণ দিয়ে তো আর চিনির স্বাদ লাভ করা যায় না।

সর্বশেষে সকল শাশুড়ীকে বলব-আজকের বউ, সেও একজন মানুষ। মানুষ মাত্র ভুল হতে পারে, তাই তাকে শত্রু মনে না করে নিজের মেয়ের মতো দেখুন, ভালবাসুন, আপন করে নিন। তাহলে আপনার বউ-ই হবে আপনার বৃদ্ধ বয়সের সহায়-সাথী।

স্বামীর প্রতি নছিহত

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়-মায়ের কথার উপর ভিত্তি করে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে অমানুষিক নির্যাতন ও মারধর পর্যন্ত করে থাকে। এভাবে স্বামীর জন্য বিনা তাহকীকে স্ত্রীর উপর জুলুম করা জায়িয হবে না। বরং বউয়ের ভুলগুলো উত্তম পন্থায় শোধরানোর ব্যবস্থা করা শাশুড়ী ও স্বামীর কর্তব্য।

আবার বউয়ের কোন কানপড়ায় চটে গিয়ে তদন্ত ও সুরাহা না করে স্বামীর জন্য স্বীয় মা-বোনদের উপর এ্যাকশন চালানোও জায়িয নয়। বরং সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিকে বুদ্ধিমত্তার সহিত সামাল দেয়া তার কর্তব্য।

উগ্র স্বভাব স্বামীর একটি নিকৃষ্ট নিন্দনীয় স্বভাব স্বামীর মধ্যে এ নিকৃষ্ট স্বভাব থাকলে, তাকে কেন্দ্র করে সেই সংসারে নির্ঘাত সংঘাত নেমে আসবে। অতএব, স্বামীকে উগ্র স্বভাব ত্যাগ করে শালীনতা, বিনয় ও নম্রতা গ্রহণ করতে হবে।

নবী পত্নী হজরত রহিমার নিঃস্বার্থভাবে স্বামীর খেদমতের জলন্ত ইতিহাস

হঠাৎ একদিন হজরত আয়ুব (আঃ) এর প্রবল জ্বর হলো। পরদিন দেখা গেল তাঁর সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে। সে ফুলার ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেল। ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হল। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে দেখে মন্তব্য প্রকাশ করলো-হজরত আয়ুব (আঃ) কঠিন গলিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন দু'চার দিনের ভিতরেই শরীরের সর্বত্র পূঁজ হবে-ফেটে যাবে। এ ব্যধি যেমন দুরারোগ্য তেমনি ছোঁয়াচে। যারা এ রোগীর সংস্পর্শে আসবে, যারা এর সেবা শুশ্রুষা করবে তাদেরও এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা রয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সত্যিই হযরত আয়ুব (আঃ) এর সর্বাঙ্গে ফোড়ারমত দেখা দিল-সেগুলি পেকে ফেটে ক্ষতে পরিণত হল। ক্ষত হ'তে সর্বাঙ্গে পূঁজ ঝরতে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রণায় হজরত আয়ুব (আঃ) ছটফট করতে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যেই শরীরের ক্ষত আরও ভীষণ আকার ধারণ করলো, মাংস পঁচে পঁচে খসে পড়তে লাগলো। শরীরে মাংসের ভিতরে সহস্র সহস্র পোকার সৃষ্টি হল-দুর্গন্ধে আর কেউ ঘেষতে পারে না তাঁর কাছে। যে নিকটে যায় সে-ই নাকে মুখে কাপড় গুজে তাড়াতাড়ি সরে আসে তাঁর নিকট থেকে, কেউ আসে না তাঁর সেবা শুশ্রুষা করতে। হজরত আয়ুব (আঃ) এর রোগ যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। হজরত রহিমা এতদিন স্বামীকে শান্তনা দিয়েছেন-এবারে কিন্তু রহিমার নিজেরই ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। স্বামীর কষ্ট দেখে তার বুক ফেটে যেতে লাগলো। হজরত আয়ুব (আঃ) এর সর্বাঙ্গ পঁচে গেছে-মাছি ভিন ভিন করছে, ক্ষতের ভিতরে অসংখ্য পোকা কিল বিল করছে, দুর্গন্ধে কেউ ঘরে প্রবেশ করতে পারছে না, বাহিরে দাঁড়ানও অসম্ভব। কিন্তু হজরত রহিমা সারাদিন স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসে থাকেন। নিজ হাতে তার শরীর হ'তে পুঁজ বের করে মুছে দেন। দৈনিক ২/৪ বার গরম পানি ক'রে স্বামীর ক্ষত ধৌত করে দেন, পথ্য খাওয়ান। হজরত আয়ুব (আঃ) মাঝে মাঝে বলে উঠেন- রহিমা! বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা, একটু বাতাস কর। হজরত রহিমা স্বামীর সে কথা শুনে চোখের পানি রোধ করতে পারেন না। অশ্রুতে তাঁর বুক ভেসে যায়। নিজের মনের ব্যথা গোপন করে তিনি স্বামীকে শান্তনা দিয়ে বলেন- স্বামী। আল্লাহ্ তায়ালাকে ডাকুন, তিনিই আপনাকে এ রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবেন, তিনি অতিশয় দয়ালু, আপনি কোন চিন্তা করবেন না! আল্লাহ্ সত্তরই আপনাকে রোগ হতে মুক্তি দেবেন, তাঁর দয়ার অন্ত নেই। তিনি কাহাকেও চিরদিন এভাবে রাখেন না। দুঃখের পরে সুখ আছে- রোগের পরে আরোগ্য আছে। হজরত রহিমার শান্তনা বাক্যে হজরত আয়ুব (আঃ)

শান্তি পান। যেন অকূলের মধ্যেও কূল দেখতে পান, যেন মৃত শরীরে জীবন ফিরে আসে। বাড়িময় রক্তপুঁজ গলিত কুষ্ঠের পঁচাক্ষতের দুর্গন্ধ। হজরত রহিমা স্বামীর সেবায় অচল, অটল। আহার নেই নিদ্রা নেই-দিবা-রাত্রি স্বামীর শয্যায় বসে তাঁর সেবা শুশ্রুষা করেন তাঁর নাকে দুর্গন্ধ যায় না। মনে তাঁর ঘৃণা লাগে না যেমন ঘৃণা করে না হজরত আয়ুবের। লাগবে কি করে? তিনি যে নিজেকে স্বামীর মধ্যেই বিলিয়ে দিয়েছেন–স্বামীকে শান্তনা দিতেই ব্যস্ত আছেন, নিজের কথা মনে করবার তাঁর অবসর নেই। দিবা রাত্রি স্বামীর খিদমত করেন আর মাঝে মাঝে খোদার নিকট মুনাজাত করেন। হে প্রভূ! আমার স্বামীকে তুমি এ কষ্ট হতে মুক্তি দাও। যদি তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তোমার নিকট কোন অপরাধ করে থাকেন তবে তার জন্য স্বামীর পরিবর্তে আমাকেই তুমি শাস্তি দাও, তবু আমার স্বামীকে তুমি আরোগ্য করে দাও। স্বামীর এ রোগ আমি হাসতে হাসতে নিজে বরণ করে নিতে রাজী আছি। পঁচা দুর্গন্ধ পুঁজের লোভে অসংখ্য মাছি ভীর করছে এসে হজরত আয়ুবের শরীরের উপরে। হজরত রহিমা পাখার বাতাস দিয়ে তাদিগকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। হজরত রহিমার পতিভক্তির জলন্ত ইতিহাস চিরদিন জগতের বুকে অমর হয়ে থাকবে। হজরত রহিমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যেয়ে চোখ দু'টি অশ্রুতে ভরে উঠলো হজরত আয়ুবের। শান্তনার সুরে তিনি বলেন– রহিমা! তুমিই প্রকৃত পতিব্রতা। তোমার এ অক্ষয় কীর্ত্তি চিরদিন জগতের বুকে অমর হয়ে থাকবে। বেহেস্তের রমণীদিগের মধ্যে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারীণী হবেন তুমিও হবে তাদেরই অন্যতমা। হজরত রহিমা স্বামীকে বাঁধা দিয়ে বললেন–হজরত! অযথা আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আমি তো আমার কর্তব্যই করে যাচ্ছি, তার অতিরিক্ত কিছু করবার মত সামর্থ্য তো আমার নেই। রমনীর বেহেস্ত তো স্বামীর পদতলে। স্বামী সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই তো নারীর ধর্ম, আর এর মাঝেই নিহিত রয়েছে তার প্রকৃত শান্তি। এ জগতে নারীর মূল্য কোথায়? স্বামীর কাছেই তো তার প্রকৃত মূল্য। দোয়া করুণ আপনার চরণতলে মাথা রেখে যেন এ দুনিয়া হতে চিরবিদায় নিয়ে যেতে পারি। হজরত রহিমার কথায় নবী সন্তুষ্ট হন। হজরত রহিমা দিবারাত্র বসে থাকেন স্বামীর শয্যাপার্শ্বে। স্বামীর ক্ষতস্থানের রক্ত পুঁজ ধুয়ে মুছে দেন দৈনিক তিন চারবার করে। দুর্গন্ধ তাঁর নাকে প্রবেশ করে না। ঘৃণা হয় না। হযরত রহিমার মত পতিপ্রাণা সতী-সাধ্বী নারী ক'জন আছে এ জগতে? নারীর ভান্ডারে তো দাঁনের অনেক কিছুই রয়েছে কিন্তু হজরত রহিমার মত সে ভান্ডার উজার করে দিয়েছে ক'জন নারী তার স্বামীর জন্য? হে রমণীগণ! তোমরাও একবার তোমাদের দানের ভাণ্ডার স্বামীর জন্য উন্মুক্ত করে দেখ, স্বামীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করে দেখ, তাতে কত আনন্দ-কত

শান্তি। হজরত রহিমার মত পতিভক্তির উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকো জগতের বুকে। দিন যেতে থাকে। আস্তে আস্তে পঁচে উঠে আয়ুব (আঃ) এর সর্বাঙ্গ। দুর্গন্ধে ভরে উঠে সমস্ত বাড়ীখানা, দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে পাড়া-প্রতিবেশী।

অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর পরিশ্রমে ও ভাবনা চিন্তায় স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো হযরত রহিমার। কালির ছাপ পড়ে গেল তার গোলাপ গন্ডদ্বয়ে। তাঁর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে হযরত আয়ুব চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না। অতিশয় স্নেহের স্বরে তিনি ডাকলেন– রহিমা! বলুন স্বামী। তোমার এ কষ্ট দেখে তো আমার প্রাণে সহ্য হয় না। তুমি কেন এত কষ্ট করছো আমার জন্যে। সন্তুষ্ট মনেই তোমাকে বলছি–তুমি চলে যাও। হজরত! চীৎকার করে উঠেন হজরত রহিমা। আয়ুব (আঃ) বলেন– রহিমা! হয়তো এই-ই আমার শেষ রোগ। আরোগ্য লাভের আর কোনই আশা নেই আমার, বৃথা কেন তুমি কষ্ট করছো। হজরত রহিমা বলেন– হজরত! স্বামীর পদতলে আশ্রয় লাভই নারীর জীবনের চরম সার্থকতা। আমার কোনই কষ্ট নেই–স্বামী! না, রহিমা। তুমি চলে যাও। তোমার মুখের দিকে তাকালে আমার বড় দুঃখ হয়। আমি চাই না যে, আমার জন্য তুমি তোমার অমূল্য জীবনটা নষ্ট করে দাও। তুমি চলে গেলেই বরং আমি খুশী হবো। স্বামী। আপনার পদতলে স্থান পাবার যোগ্য কি আমি নই? যদি জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে কোন অপরাধ করে থাকি, যদি আপনার সেবা যত্নে কোন ক্রটি হয়ে থাকে, তবে আমাকে যে কোন প্রকারের শাস্তি দিন আমি তা মাথা পেতে গ্রহণ করবো, কিন্তু এমন কথা আর কখনও বলবেন না। নারীর জীবনে স্বামীই সব কিছু, স্বামীর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই নারীর কাছে। যে নারী স্বামী-সেবা হ'তে বঞ্চিতা তার জীবনের কোন মূল্য নেই, আপনার পদপ্রান্তে মাথা রেখে মরতে পারলেই যে আমি নিজ জীবন স্বার্থক বলে মনে করবো! অতিক্রান্ত হ'তে থাকে মাসের পর মাস। হজরত আয়ুব (আঃ) এর অসুখ দিন দিন বাড়তেই থাকে। পঁচা ঘা ক্রমে আরও পঁচে উঠে। দুর্গন্ধে অতীষ্ঠ হয়ে উঠে গ্রামবাসী, আতঙ্ক জাগে তাদের মনে। তারা ভাবে আয়ুব নবীর ঐ রোগ বুঝি ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামে। তাই তারা সংকল্প করে আয়ুব (আঃ) কে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে। একদিন তারা সকলে দল বেঁধে এসে হাজির হয় হযরত আয়ুবের নিকট। নাকে মুখে কাপড় গুঁজে তাঁরা তার নিকটে যেয়ে নির্দয়ের মত বলে– হুজুর! আমাদের বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনার নেমক খেয়েই আমরা মানুষ সে কথা ভুলে যাইনি–তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার ঘায়ের দুর্গন্ধে আমরা আর টিকতে পারছিনা গ্রামে। দুষিত হয়ে যাচ্ছে গ্রামের বায়ু। একদিন হয়তো ও রোগ ছড়িয়ে পড়বে সারাগ্রামে। তাই আমাদের অনুরোধ আপনি এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। স্বেচ্ছায় না গেলে আমরা আপনাকে জোর করে তাড়িয়ে

দিতে বাধ্য হব। রহিমা অতি বিনীতভাবে গ্রামের সকলকে বললেন- ভাইসব! আমি নিতান্ত অসহায়া স্ত্রীলোক। আজ অমাবস্যা রজনী। ঘোর অন্ধকার, তার উপর অবিরল ধারায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে, এই দুর্যোগের রাত্রে আমি কেমন করে আমার স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাবো? আপনারা দয়া করে আজকের রাত্রটা আমাকে সময় দিন। আগামীকাল যেমন করেই হোক আমি তাঁকে নিয়ে অন্যত্র চলে যাব। গ্রামের লোকেরা সকলে সমস্বরে বলে উঠলো- ওসব হবে না। কেমন করে যাবে, কোথায় যাবে-ওসব কথা আমরা জানি না। যেমন করে পারো যেখানে খুশী চলে যাও। আমাদের গ্রামে থাকতে দেব না, এই সোজা কথা। আবার বলছি আজ রাত্রের মধ্যে যদি না যাও তবে কাল সকালে বুঝবে মজাটা। গ্রামের মানুষ চলে গেল। হযরত আয়ুব (আঃ) বললেন চলো তুমি আমার এক হাত ধরো আমি আর এক হাত তোমার কাঁদের উপরে রেখে ধীরে ধীরে এখান থেকে চলে যাই। হজরত রহিমা আজ সত্যিই বড় অসহায়া-বড় নিরুপায়, তিনি একাকিনী স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাবেন আর কেমন করেই বা যাবেন, কিছুই স্থির করতে পারছেন না অথচ যেতেই হবে। অবশেষে স্বামীকে একখন্ড কাপড়ে জরিয়ে কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। স্বামীকে পানি থেকে রক্ষা করবার জন্য বড় একখানা কলার পাতা দিয়ে ঢেকে নিলেন যাতে তাঁর জামা কাপড়গুলি ভিজে না যায়। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, সম্মুখে জনহীন বিরাট প্রান্তর। কাঁধে স্বামী আর মুখে আল্লাপাকের পাক নাম-গন্তব্যস্থল অজ্ঞাত। বহু মাঠ প্রান্তর, বন-জঙ্গল, নালা-নর্দমা, পার হয়ে এক গভীর জঙ্গলের পার্শ্বে একটি বড় গাছের নীচে স্বামীকে নামিয়ে রাখেন হজরত রহিমা। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে তখন প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে চায় তাঁর। স্বামীকে নামিয়ে রেখে হজরত রহিমা স্বামীর অনুমতি নিয়ে জঙ্গল থেকে কিছু কাঠ ও লতা পাতা সংগ্রহ করে সেখানে নির্মাণ করলেন একখানি কুটির। তারই ভিতরে শয্যা করে দিলেন হজরত আয়ুবকে। এতক্ষণে তিনি যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারলেন। বাড়ি থেকে চলে আসবার সময়ে সামান্য কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন হজরত রহিমা। স্বামীকে কুটিরের ভিতরে শয়ন করিয়ে রেখে স্বামীর অনুমতি নিয়ে তিনি চললেন গ্রামের দিকে কিছু খাদ্যবস্তু কিনে আনতে। লোকালয় থেকে কিছু চাল, ডাল, লবণ, মরিচ কিনে রান্না করে স্বামীকে খাওয়ালেন-নিজেও কিছু খেলেন। তারপর আবার শুরু করলেন তিনি স্বামীর পরিচর্যা। এমনিভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। যে সামান্য ক'টি টাকা ছিল তা ফুরিয়ে গেল। উপায়ন্তর না দেখে হজরত রহিমা স্বামীর অনুমতি নিয়ে আপন হাতের দু'গাছি চুরি নিয়ে গ্রামে চলে গেলেন। চুড়ি দু'খানা বিক্রি করে তার দ্বারা আরও কয়েকদিন চলে গেল। এরপর হজরত রহিমা স্বামীর অনুমতি নিয়ে কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লেন লোকালয়ের দিকে। কয়েক বাড়ি ঘুরা ফিরা করার পর এক বাড়িতে কাজ

পেলেন তিনি। কাজ আর কি? চাকরানীগণ যা করে তাই। সারাদিন কাজ করবেন সন্ধ্যার সময়ে দুবেলা আহারের উপযোগী গম, ডাল, লবণ, মরিচ ইত্যাদি পাবেন। প্রত্যহ সকালে উঠেই হজরত রহিমা স্বামীর ক্ষত ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে স্বামীকে কিছু আহার করিয়ে স্বামীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে হাতের কাছে রেখে তিনি চলে যান সারাদিনের জন্য লোকালয়ের দিকে। আবার সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে রান্না করেন। স্বামীকে খাওয়ান নিজেও কিছু খান, তারপর আবার লেগে যান স্বামীর রোগ পরিচর্যায়। এদিকে পাপাত্মা ইবলিশ একজন স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলল তোমাদের বাড়িতে রহিমা নামে যে একটা মেয়ে কাজ করে তার স্বামীর সর্বাঙ্গ গলিত কুষ্ঠ রোগে পঁচে গেছে, সব শরীরে পোকা পরে গেছে, দুর্গন্ধে টিকতে না পেরে গ্রামের লোক তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রহিমা নিজ হাতে তার স্বামীর সেই সব রক্ত পুঁজ সাফ করে তার স্বামীর সেবা শুশ্রুষা করে! তাকে দিয়ে তোমাদের কোন কাজ কর্ম করান তো দূরের কথা-তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াও উচিত নহে। যে দুরন্ত ব্যাধি আর যেমন ছোঁয়াচে রোগ ওটা-একবার যদি একজনকে আক্রমণ করে তবে গ্রামশুদ্ধ কেউ রক্ষা পাবে না! কাজ করবার মানুষ কি আর পাওয়া যায় না, না কি? খবরদার ওকে আর বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দিও না। শয়তান ইবলিশ একে একে গ্রামের সব বাড়িতেই যায় আর নানা প্রসঙ্গে ও কথাটা বেশ ভালভাবেই প্রচার করে! তার এ প্রচারণায় বেশ ভাল কাজও হয়। পরদিন হজরত রহিমা কাজ করতে এলে তাকে সবাই জিজ্ঞেস করে তোমার স্বামীর কি অসুখ? হজরত রহিমা কোন কথা গোপন না করে বলেন- গলিত কুষ্ঠ ব্যাধি মা! এ কথা শুনে সবাই তাঁকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, কেউ তাকে কাজ করতে দেয় না। এমনকি বাড়িতে দাঁড়াতে পর্যন্ত দেয় না। সারাদিন ঘুরেও সে কোন বাড়িতে একটা কাজের যোগাড় করতে পারলো না। অবশেষে হজরত রহিমা শেষ চেষ্টা করে দেখবার আশায় আর একটি বড় বাড়িতে উঠে সে বাড়ির গৃহিণীকে বললেন- মা! দয়া করে আমাকে সামান্য কিছু আটা ধার দিন। আমি আগামী কাল এসে আপনার কোন কাজ থাকলে তা করে দেব, অথবা অন্য বাড়িতে কাজকর্ম করে যা পাই তা দিয়ে আপনার ধার শোধ করে দিয়ে যাব। আমাকে আটা না দিলে আজ আমার রুগ্ন স্বামী উপবাস থেকে হয়তো মরেই যাবেন। আসলে কিন্তু যার সাথে হজরত রহিমা কথা বলছিলেন, সে বাড়ির গৃহিণী নয়। গৃহিণীর বেশ ধারণ করে ইবলিশ শয়তান গিয়েছিল। হজরত রহিমাকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে শয়তান সেই সুযোগে গৃহিণীর বেশ ধারণ করে বসে রইলো। হজরত রহিমা তাকে গৃহিণী মনে করে তার সাথে কথা বলছিলেন। গৃহিণী বেশধারি শয়তান বললো- তোমার মাথায় সুন্দর ঘণ কালো ও লম্বা চুল দেখতে পাচ্ছি, যদি উহা আমাকে কেটে দিতে পার তবে তোমাকে দু'দিনের

খাওয়ার উপযোগী আটা দিয়ে দিতে পারি। হজরত রহিমা বললেন-মা! আমাকে মাফ করবেন, আমি আমার স্বামীর বিনা অনুমতিতে মাথার চুল কেটে দিতে পারি না। তাছাড়া তিনি এমনই অসুস্থ যে নিজে বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। আমার এই মাথার চুল ধরে তিনি উঠা বসা করেন- এগুলি কেটে দিলে তাঁর খুব অসুবিধাও হবে। গৃহিণী বললো-তবে বাপু পথ দেখ। একালে কি কাউকে ভাল বুদ্ধি দিতে হয়? না ভাল করতে হয়? সামান্য একগোছা চুলের বদলে দু'দিনের খোরাকী দিতে চাইলাম কিনা, আর চুলের কদর বেড়ে গেল। বেশ তোমার চুল নিয়ে তুমি পথ দেখ বাপু-এখানে কিছু পাবে না। একেবারে নিরুপায় হয়ে হজরত রহিমা অগত্যা মাথার চুল কেটে দিয়ে গম ডাল নিয়ে প্রস্থান করলেন। এদিকে হজরত রহিমা স্বামীর নিকটে পৌছাবার পূর্বেই শয়তান তাড়াতাড়ি হজরত আয়ুব (আঃ) এর নিকটে যেয়ে বললো। হুজুর আপনার স্ত্রী রহিমা আজ অনেক দিন যাবত আমাদের গ্রামে যেয়ে কাজকর্ম করে। তার কাছেই শুনেছি যে আপনি একজন পয়গাম্বর-আবার বাদশাও ছিলেন এক সময়। মেয়েটাকে আমরা ভাল বলেই বিশ্বাস করতাম কিন্তু সে যে এমন পাকা চোর তা কি আগে বুঝতে পেরেছি? শয়তানের কথা শুনে হজরত আয়ুব বললেন- কি! কি বললে রহিমা চোর? না এ হতেই পারে না। তুই নিশ্চয়ই দুরাচার পাপাত্মা ইবলিশ। অযথা রহিমার নামে দুর্নাম লাগাতে এসেছিস। দুর 'হ' আমার নিকট হতে। শয়তান বললো- আজ এক বাড়ির মালিক তার মাথার চুল কেটে রেখে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রহিমা এলেই আমার কথা সত্য কি মিথ্যা তা দেখে নেবেন। তখন বুঝবেন যে আমিই ইবলিশ, না রহিমাই ইবলিশের বউ! কথা কয়টি বলেই শয়তান সেখান থেকে চলে গেল। এর একটু পরেই হজরত রহিমা এসে পৌছলেন স্বামীর নিকট। হজরত আয়ুব (আঃ) সর্বপ্রথমেই লক্ষ্য করলেন তাঁর মাথার দিকে। মাথার উপর দৃষ্টি পড়া মাত্রই রাগে দুঃখে তাঁর সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরে গেল। বললেন পয়গম্বরের স্ত্রী হয়ে পেটের জ্বালায় তুমি চুরি করবে এ যে আমার কল্পনার অতীত ছিল। আমার ক্ষমতা থাকলে এক্ষুণি বেত্রাঘাতে তোমার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে তোমাকে তাড়িয়ে দিতাম। গণে গণে একশত কোড়া লাগাতাম তোমার শরীরে। রহিমা বলল স্বামী! আমায় বিশ্বাস করুণ। আজ সুদীর্ঘ আঠারো বছরের মধ্যে একটি হারাম দানাও আমার বা আপনার পেটে যায়নি। বিশ্বাস করুণ চুরি করা কেন; কোন দানের বস্তু পর্যন্ত আমি কাহারও কাছ থেকে গ্রহণ করেনি। তবে আপনি শত কোড়া কেন, হাজার কোড়া মেরে যদি আমার অস্তিত্ব দুনিয়া হতে মুছে ফেলে দিন তবুও আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না? কিন্তু হজরত বিনা দোষে আপনার এ চির দাসীকে আপনার চরণসেবা হতে বঞ্চিত করবেন না। আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না রহিমা। নিজের চোখকে তো আর আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। তুমি জনৈক গৃহস্থ

বাড়িতে গম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলে-তারা সেই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তোমার মাথার চুল কেটে দিয়েছে। এ কথা কি তুমি অস্বীকার করতে চাও? তুমি অস্বীকার করলেও চোরের কোন কথাই আমি আর বিশ্বাস করতে পারিনা। হজরত রহিমা কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন- হজরত! আপনি বিশ্বাস করুণ আর না করুণ সত্য ঘটনা যা, তা আমি খুলে বলছি-যদি আমার কোন শত্রু আপনার কানে বিষ ঢেলে দিয়ে থাকে তা বিশ্বাস না করার জন্য আপনাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। দয়া করে আমার কথা ক'টি শুনুন, তারপরে আপনি যা কর্তব্য বলে মনে করেন তাই করবেন। অদ্য সকাল থেকে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত গ্রাম ঘুরেও কোন কাজ জোগাড় করতে পারিনি। অবশেষে জনৈক ধনী গৃহস্তের বাড়িতে যেয়ে আমি তার কাছে সামান্য কিছু গম ধার চাওয়ায় সে বললো যে, ধার তোমাকে দিতে আমি পারবোনা তবে তোমার মাথার চুলগুলি যদি আমাকে কেটে দাও তবে তার বদলে তোমাদের দু'জনের দু'দিনের উপযোগী গম, ডাল দিতে পারি। আপনার বিনা অনুমতিতে মাথার চুল কেটে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত নয়, বিশেষতঃ এতে আপনার অসুবিধাও হবে এজন্য আমি প্রথমে অস্বীকারই করেছিলাম কিন্তু যখন দেখলাম যে খালি হাতে যেয়ে আমার রুগ্ন স্বামীকে কি খাওয়াবো? তখন উপায়ন্তর না দেখে মাথার চুল কেটে দিয়ে তার বিনিময়ে আমি এই গম, ডাল এনেছি। ক্রমে রাত গভীর হয়ে এলো। হজরত রহিমা ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বামীর পদ প্রান্তে মাথা রেখে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। হজরত আয়ুব (আঃ) তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন। এমন সময় হজরত জিব্রাইল ফেরেস্তা এসে হজরত আয়ুব (আঃ) কে বললেন- হে আল্লাহর নবী! আমি আল্লাহর বাণী নিয়ে আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। হজরত রহিমা আল্লাহর অতিশয় প্রিয় পাত্রী। তাঁর উপরে যে অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ তাঁর প্রতি স্বয়ং অসন্তুষ্ট হন। সে নির্দোষ সতী নারী, সে আপনাকে যা বলেছে তার প্রত্যেকটি কথা সত্য। আপনি শয়তানের ধোকায় পড়ে অকারণে তাঁর প্রাণে ব্যথা দিয়েছেন। অবিলম্বে তাঁকে শান্তনা প্রদান করুন। হযরত আয়ুব তৎক্ষণাৎ চীৎকার করেই বলে উঠলেন- রহিমা! রহিমা! আমি বুঝতে না পেরে পাপাত্মা শয়তানের কথায় ভুলে তোমাকে কটু কথা বলেছি-ব্যথা দিয়েছি, সে জন্য দুঃখ করো না। তুমি শুনে সন্তুষ্ট হও-স্বয়ং আল্লাহ্পাক তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আল্লাহ্ যাদের সহায় শয়তান তাদের কোন অনিষ্টই করতে সক্ষম নহে। প্রানের রহিমাঃ ভুল করে আমি তোমাকে ভুল বুঝে ছিলাম তাই তোমাকে অনেক কর্কশ কথা বলে তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা দিয়েছি সে কথা ভুলে যাও। হজরত রহিমা স্বামীর রক্ত পূঁজে পরিপূর্ণ ক্ষতভরা বক্ষে মাথা রেখে বলতে থাকেন-আপনার তিরস্কার কর্কশ বাক্যে আমি বিন্দুমাত্রও দুঃখ পাইনি হজরত। আমার শুধু একমাত্র আশঙ্কা ছিল যে, আপনি আমাকে আপনার পদসেবা হতে বঞ্চিতা করবেন।

পরদিন ভোরে উঠে হজরত রহিমা স্বামীর ক্ষত পরিস্কার করে তাকে ওজু করিয়ে জায়নামাজে বসিয়ে দিয়ে আবার চলে যান গ্রামের দিকে খাদ্য সংগহের জন্য। হজরত আয়ুব (আঃ) গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। আল্লাহ পাকের আদেশে হজরত জিবরাইল (আঃ) হজরত আয়ুব (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন- হে আল্লাহর নবী! আমি আল্লাহর বাণী নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। পরম করুণাময় আল্লাহপাক নানারূপ বিপদে ফেলে আপনার ঈমান পরীক্ষা করলেন! আপনি সে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আজ হতে আপনি সকল বিপদ থেকে মুক্তি পাবেন। আপনি ডান পা দ্বারা জমিনে আঘাত করুন তাতে দুটো নহর সৃষ্টি হবে। একটির পানিতে গোসল করুন অপরটির পানি পান করুন- এতে আপনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হবেন ও পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। হজরত জিবরাইল (আঃ) এর নির্দেশ মত হজরত আয়ুব ডান পা দ্বারা মাটিতে পদাঘাত করা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে দুটো ঝরণার উৎপত্তি হলো। হজরত আয়ুব (আঃ) তার একটির পানি দ্বারা গোছল করলেন ও অপরটির পানি পান করা মাত্র তার শরীরের আঠারো বৎসরের ক্ষত মিলিয়ে যেয়ে পূর্বের সৌন্দর্য ফুটে উঠলো। এদিকে সন্ধ্যার পূর্বে হজরত রহিমা গ্রাম থেকে ফিরে এসে কুটিরে রুগ্ন স্বামীকে দেখতে না পেয়ে জবেহ্ করা মুরগীর ন্যায় ছটফট করতে লাগলেন-তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তিনি ধারণা করলেন যে হয়তো তাঁর স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় বনের জীবজন্তু তাঁর লাশ নিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তিনি মণিহারা ফণির মত জঙ্গলের মধ্যে স্বামীকে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে না পেয়ে অজ্ঞান হয়ে বনের মধ্যে বসে পড়লেন। হঠাৎ আয়ুব (আঃ) তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ডাকলেন-রহিমা! হজরত রহিমা পিছনে ফিরে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। আয়ুব (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন- আমাকে চিনতে পারছোনা রহিমা! হজরত রহিমা উঠে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে মাথা রেখে বললেন- যে মুখচ্ছবি আমার অন্তরে দিবারাত্রি প্রতি মুহূর্তে অঙ্কিত থাকে সে মুখখানা কি কখনো ভুল হতে পারে স্বামী। তবে আমি ভাবছি এ অসম্ভব কিরূপে সম্ভব হল। তিনি হজরত রহিমাকে সব কথা খুলে বললেন। হজরত রহিমা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শোকরিয়া আদায় করলেন। সত্যিই আজ তাঁর মত সুখী দুনিয়ায় কেউ নেই।

বর্ণিত বিবরণে দেখা যায় হযরত রহিমা স্বামীর চরম বিপদ মুহূর্তে যখন স্বামীর পাশে কেউ ছিলনা তখনও তিনি স্বামীর খেদমত করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতে সুখী হয়েছেন। অতএব, যে সমস্ত স্ত্রীরা স্বামীর খেদমত করবে না, স্বামীর কথামত চলবেনা, স্বামীর আদেশ পালন করবেনা, কিয়ামত ময়দানের ভয়াবহ অবস্থায় যদি হযরত রহিমাকে এক পাশে রাখা হয় আর ঐ সমস্ত মহিলাদের এক পাশে রাখা হয় তখন তাদের জবাব দেওয়ার মত কিছুই থাকবেনা। সুতরাং স্ত্রীদের দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতেসুখী হতে হলে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (আকায়েদ, তাছাওউফ ও ফিকাহ্) শিক্ষা ও আমলের মাধ্যমে সুখে-দুঃখে সবর্দা ঠিকমত স্বামীর খেদমত করে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। মহান আল্লাহ্তায়ালা স্ত্রীদেরকে স্বামীর খেদমত করে এবং স্বামীদেরকে স্ত্রীর হক আদায় করে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হওয়ার মত তৌফিক দান করুক। আমীন, ছুম্মা আমী।

প্রথম খন্ড সমাপ্ত, দ্বিতীয় খন্ড পাঠ করুন।